মমতাজ লতিফ

মানবিক শিক্ষার খোঁজে

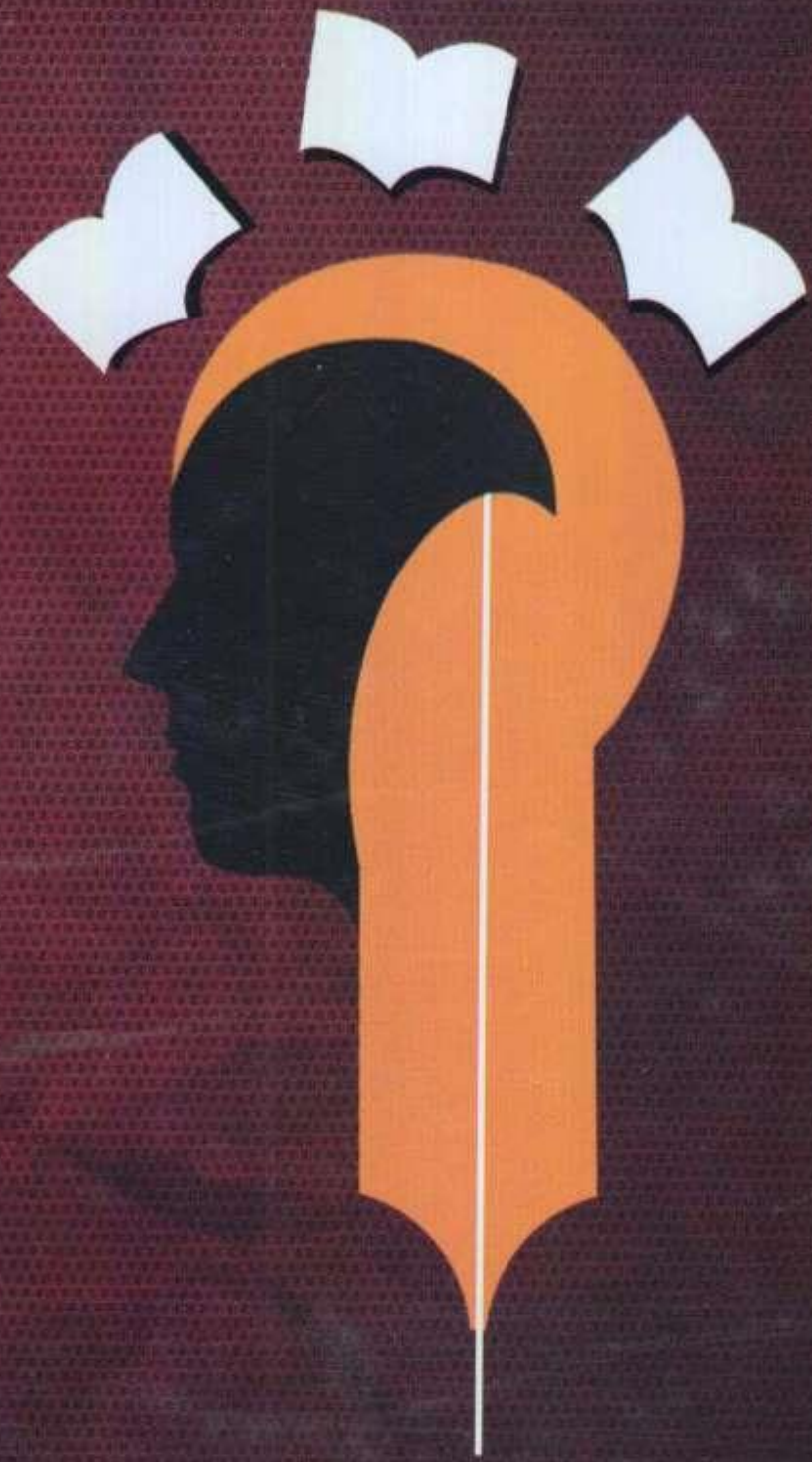

মানবিক শিক্ষার খোঁজে

www.amarboi.org

www.amarboi.org

মানবিক শিক্ষার খোঁজে

মমতাজ লতিফ

আগামী প্রকাশনী

www.amarboi.org

প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৪২১ সেপ্টেম্বর ২০১৪

প্রকাশক ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০ ফোন ৭১১-১৩৩২, ৭১১-০০২১
প্রচ্ছদ : শিবু কুমার শীল
মুদ্রণে স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন, ঢাকা

মূল্য : ২৫০.০০ টাকা

Manobik Shikkhar Khoje : collection of essay::
by Momtaz Latif
Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Bangla Bazar, Dhaka-1100, Bangladesh.
e-mail: info@agameeprakashani-bd.com
First Printing : September 2014

Price: Tk.250.00/US $ 8.00 only

ISBN 978 984 04 1673 8

www.amarboi.org

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় যে দুজনের কাছে
জ্ঞান-ঋণে আমি আবদ্ধ,
সেই দুই শিক্ষক
আদর্শ খান্না ও অভয়া দেবা
কে
এ বইখানি উৎসর্গ করলাম।

www.amarboi.org

www.amarboi.org

সূচিপত্র

প্রাক শৈশব ও শৈশবকালীন যত্ন ও বিকাশ ১১
শিশুর বিকাশ এবং ভালো মা-বাবা হওয়ার শিক্ষা ২১
বাংলাদেশে শিশুর শৈশবকালীন যত্ন, শিক্ষা ও বিকাশ ২৬
মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনীয়তা ৩৮
কৈশোর শিক্ষা : একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র ৪৪
শিক্ষকের দায়বদ্ধতা ৫০
শিক্ষা ও টেকসই উন্নয়ন ৫৬
বিদেশি ভাষা, অসুবিধাগ্রস্ত শিক্ষার্থী ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা ৬৬
মানসম্মত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ৭২
ক্যাডেট নয়, দরকার মানসম্মত মাধ্যমিক স্কুল ৮২
মন্ত্রী ও নেতাদের সন্তানরা মাদ্রাসায় পড়ে? ৮৬
জঙ্গিবাদ আধুনিক শিক্ষা ও সমাজের জন্য চ্যালেঞ্জ? ৯৪
গণহিস্টিরিয়া কি নারী শিক্ষাবিরোধী কোনো অপতৎপরতা? ৯৯
কওমি মাদ্রাসা, নিজেদেরই প্রশ্ন করুন ১০৫
অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি জাতির অগ্রযাত্রার পূর্বশর্ত ১০৯
শিক্ষার সংস্কার ও সংস্কারের জন্য শিক্ষা ১১৩
শিক্ষা : নারী পুরুষ সমতা ১২৪
জনসংখ্যা উন্নয়ন ও উন্নয়নে নারী ১৩০

www.amarboi.org

আমার কথা

জীবনের কর্মক্ষেত্র শুরু করেছিলাম শিক্ষক হিসাবে, সেই ১৯৭২ সালে। অবশ্যই দেশটি—'৭১ -এ স্বাধীন হয়েছিল বলে সে সময়ে দেশ গড়ার বিপুল কর্মযজ্ঞে বঙ্গবন্ধু সরকার দশভুজার মত দশ দিকে কাজ করছিল যার ফলে দেশের সব জেলা সরকারি মহাবিদ্যালয়ে 'সমাজবিজ্ঞান' বিষয়টি পাঠ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। এর আগে সমাজবিজ্ঞান বিষয়টি কোনো মহাবিদ্যালয়ে পাঠ্য বিষয় হিসেবে ছিল না। সেই শুরু। বাবা আবুল ফজল একজন সন্তান তাঁর মতন শিক্ষকতা পেশাকে বেছে নেয়ায় খুব খুশি হয়েছিলেন। তবে, সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক হয়ে পেশা জীবন শেষ করা হয়নি। বদলির কারণে যোগ দিতে হলো এনসিটিবির শিক্ষাক্রম বিভাগে, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ হিসেবে, ডেপুটেশনে। বিশেষজ্ঞ নয়, তবু কিছুটা 'বিশেষজ্ঞ' হওয়ার তাগিদে শিক্ষা, শিশু শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, শিক্ষক্রম ইত্যাদি বিষয়ে পড়াশোনা শুরু করলাম। এক সময় ব্রিটিশ কাউন্সিলের বৃত্তি নিয়ে এডিনবরা থেকে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন বিষয়ে পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিগ্রি নিলাম। এরপর দিল্লি থেকে প্রফেসর আদর্শ খান্না পরামর্শক হয়ে এলেন "যোগ্যতা ভিত্তিক শিক্ষাক্রম" প্রণয়নে আমাদের সহায়তা করতে। তার কাছ থেকে শিখেছি শিক্ষা বিষয়ক নানা কলা-কৌশল, আহরণ করেছি নানা বিচিত্র, বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গী। তাঁর কাছে আমি জ্ঞান-ঋণে সারাজীবন ঋণী থাকবো, ভুলবো না '৪৭-এ রাওয়ালপিন্ডির বাড়ি ঘর ছেড়ে মুহূর্তে পথে নামা সুদর্শনা তরুণী দিল্লিতে পরিবারের সাথে নতুন আবাস গড়ে তুলে পরে উচ্চশিক্ষিত, বিনয়ী, রুচি, স্নিগ্ধ, দীর্ঘাঙ্গী, আমার চেয়ে জ্যেষ্ঠ বড় দিদির মত প্রফেসর আদর্শ খান্নাকে। তাঁর প্রিয় কুকুর আমাকে দেখেই যখন আমার বুকে দু'পা তুলে দাঁড়াতো, উনি হেসে বলতেন-'দ্যাখ, ও 'ও তোমাকে কত ভালোবাসে, ও তোমাকে আমার ছোট বোন মনে করছে।'

এরপর আসেন শিশুশিক্ষা বিষয়ে পরামর্শক হিসেবে শ্রীলংকা থেকে শ্রীমতি অভয়া দেবা যাঁর কাছ থেকে শিখেছি শিশুর গোপন গহন মনে বিহার করতে। এঁর কাছেও আমার অনেক জ্ঞান-ঋণ।

বাবার নানা লেখা থেকেও আহরণ করেছি মানবিক শিক্ষার নানা বৈশিষ্ট্য। আমার স্বামী অধ্যাপক আবু হামিদ লতিফ-এর সঙ্গে দীর্ঘকাল সংঘর্ষে-আঁতাতে যে জীবন কাটাচ্ছি, এ জীবনেও শিক্ষাক্ষেত্রের বহু অজানা তথ্য তাঁর কাছ থেকে

www.amarboi.org

জেনেছি। মা ছিল অতি মানবিকতাপূর্ণ মনের অধিকারী। এঁদের কাছ থেকেও মানবিক হবার অনেক আচরণ দেখেছি, শিখেছি।

এতক্ষণ এত জনের কথা বলেছি, এবার বন্ধুদের কথা না বললেই নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু নীলুফার, মাহফুজা, বিউটি, রুবী, রওশন, শাহাবুদ্দিন, নূরুল ইসলাম, মোনায়েম সরকারসহ সবাই খাঁটি অসাম্প্রদায়িক মানবিক মনের অধিকারী যাদের সান্নিধ্য আমাকে অসাম্প্রদায়িক-মানবিক শিক্ষার উপকরণ, উপাদান আবিষ্কারে প্রণোদিত করেছে— এ কথা না বললে অকৃতজ্ঞতা হবে। ভাই আবুল মঞ্জুর, আবুল মহাসীন, মনছুর, মোমেন, পাহাড়ী— এরাও আমার দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে কম ভূমিকা রাখেনি।

অবশ্য যে বইটি এত কথা বলার পর পাঠকের হাতে পৌঁছাবে, তাঁরা অবাক বিস্ময়ে তাতে বেশি কিছু খুঁজে পাবেন না। সব অভিজ্ঞতা লিখতে পারিনি, যাও বা লিখেছি, সব রচনা খুঁজে পাইনি। এ আমার নিজেস্ব অক্ষমতা। তবু, যারা শিক্ষা নিয়ে ভাবছেন, ভাবেন, বিশেষ করে তরুণ তরুণীরা, তারা মানবিক, অসাম্প্রদায়িক ও আধুনিক এক শিক্ষার খোঁজে বেরিয়ে পড়বে— এ আশা করে বইটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি।

বইটি প্রকাশের ঝামেলা গ্রহণ করে আগামী প্রকাশনী আমাকে বাধিত করেছে, সেই জন্য তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

মমতাজ লতিফ
শাহবাগ, ঢাকা
১৪ জানুয়ারি, ২০১৪

www.amarboi.org

প্রাক শৈশব ও শৈশবকালীন যত্ন ও বিকাশ

ভূমিকা

মানুষ তার সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী বাবা-মা হতে ভালোবাসে। সন্তানের জন্ম শুধু যে তার বংশ রক্ষা করে তা নয়, এই নবজাতক শিশু নিজেই আনন্দের উৎস হয়ে বাবা-মা সহ আত্মীয়-স্বজনকে আনন্দ দেয় এবং বাবা-মায়ের ভূমিকাকে নানামুখী কর্মতৎপরতার দ্বারা যুগের চাহিদার আলোকে সঞ্জীবিত করে চলেছে। মানুষ দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে শিশুকে মানুষ করার নানারকম কলাকৌশল রীতিনীতি আবিষ্কার করেছে এবং এসব রীতিনীতির মধ্যে একটি ঐক্য রয়েছে। মানুষ তার সাংস্কৃতিক, সামাজিক পরিমণ্ডলের প্রভাবে নিজস্ব সংস্কৃতির ঐতিহ্য হিসাবে নিজস্ব শিশু লালন-পালনের কলাকৌশল তৈরি করেছে এবং যুগের চাহিদা অনুযায়ী তা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন রীতিনীতির জন্ম দিয়ে চলেছে। এ অবস্থার মধ্যে দরিদ্র দেশগুলোতে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীতে শিশু যে মৃত্যুঝুঁকি ও শঙ্কার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এবং তার বুদ্ধি নানারকম রোগ দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয় তা ধনী দেশের শিশুর জন্য প্রযোজ্য নয়। এই শৈশবকালীন রোগকে প্রতিরোধ করার জন্য উন্নয়নশীল দেশে শিশু প্রতিরক্ষা কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে এবং সাম্প্রতিককালে এই কার্যক্রমের সফলতার কারণে দেখা যাচ্ছে বিশ্বে জন্মগ্রহণ করা প্রতি ১৩ জন শিশুর মধ্যে ১২ জন মৃত্যুঝুঁকি উপেক্ষা করে একবছর বয়স লাভ করবে। অনুমান করা যাচ্ছে যে, ২০০০ সালের মধ্যে প্রতি ২০ জনে ১০ জন শিশু একবছর বয়স পর্যন্ত অনায়াসে বেঁচে থাকবে। এখানেই এসে পড়ে শৈশবকালীন যত্ন ও বিকাশমূলক কাজের গুরুত্ব। যে ১২ জন বা ১৯ শিশু বেঁচে থাকবে তারা কিভাবে বেড়ে উঠবে এটি একটি বড় প্রশ্ন হিসাবে দেখা দিয়েছে। শুধু প্রাণধারণ করা মানুষের জন্য অর্থবোধক নয় বরং বয়সোচিত বিকাশ সাধন করা, দৈহিক, মানসিক বুদ্ধি ঘটানোই প্রাক-শৈশব বা শৈশবকালীন লালন পালনের মূল লক্ষ্য। লালন পালনের ক্ষেত্রে এটা খুবই জরুরি যে, শৈশবকালীন কোনোরকমের ঘাটতির ফলে শিশু কোনো বিশেষ ধরনের প্রতিবন্ধিতার দ্বারা রুগ্ন হয়ে পড়ে কিনা। অর্থাৎ এক কথায় বলা চলে,

www.amarboi.org

শুধু বেঁচে থাকা নয়, প্রতিবন্ধিতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া এবং শিশুর বয়সোপযোগী সার্বিক বিকাশ ঘটানোর জন্য শিশুর বাবা, মা, শিশুর লালনপালনকারী প্রস্তুত হয়েছে কিনা-এ বিষয়টি আন্তর্জাতিক শিশু বিশেষজ্ঞদের চিন্তিত করে তোলে। আসলে শিশু প্রতিরক্ষার পরপর বা শিশুর প্রাণে বেঁচে থাকার পাশাপাশি সমাজ ও বাবা মায়ের দায়িত্ব হচ্ছে শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, পঞ্চইন্দ্রিয়সহ শারীরিক আবেগিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিগত বিকাশ যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা, প্রয়োজনে যথাযথ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এসবের মাধ্যমে ছোট শিশুকে তার পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ নিশ্চিত করা। এ কথা বলা বাহুল্য যে, দরিদ্র পরিবারে প্রতিকূল পরিবেশে শিশুর বেঁচে থাকাসহ বেড়ে ওঠা, যথোপযুক্ত বিকাশ লাভ করা বিশাল বাধার সম্মুখীন হয়, শুধুমাত্র শিশুকে বাঁচিয়ে রাখা ও রোগ থেকে রক্ষা করা দরিদ্র বাবা-মার লালন-পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। শিশুর অন্যান্য বিকাশ যে তার অধিকার, এ সম্বন্ধে কিছু করার সময় তাদের নেই যে তা নয়, বরং এ বিষয়ে তারা সচেতন ও সজ্ঞান নয়। অপর দিকে শুধু যে দরিদ্র, নিরক্ষর পরিবারগুলোর চিত্র এরূপ তা নয় বরং শিক্ষিত সচ্ছল পরিবারেও শিশুর বিকাশ সম্পর্কিত সচেতনতার মান খুবই নিচে।

দেখা যায়, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে শিশু একটু বড় হলেই সে বড়দের পূর্বের মনোযোগ ও আদর হারিয়ে ফেলে। সমাজ ও পরিবার খুব দ্রুতই তার কাছ থেকে কাজ ও কর্তব্য দাবি ও আশা করতে শুরু করে। তাকে শৈশবের যে সময়টুকু দেওয়া দরকার, তাও দেওয়া হয় না। দরিদ্র সমাজ ও পরিবারের মৌলিক প্রয়োজনের, অভাবের বিশাল গ্রাসের মধ্যে শিশুর কাছ হতে অতি দ্রুতই শৈশব প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। আমাদের দেশের দরিদ্র একটি পরিবারের সাত/আট বছরের শিশুর কাঁধে যে কর্তব্যর ভার চাপিয়ে দেওয়া হয় তা একনজরে দেখলে আমাদের বিস্মিত হতে হয়, যা হচ্ছে-ছোট ভাইবোনের দেখাশোনা, জ্বালানি বা লাকড়ি, গোবর, পাতা সংগ্রহ, পানি আনা, ঘর উঠান ঝাড়ু দেওয়া, গৃহপালিত পশু-পাখি থাকলে তাদের খাওয়ানো, দেখাশোনা করা, ক্ষেত থাকলে ক্ষেতে পানি দেওয়া, আগাছা তোলা, ক্ষেতের কাজে বাবা-মাকে সাহায্য করা, দোকানে, হাঁটে কেনাকাটা করা কোনো উৎপন্ন দ্রব্য বেচা, হাঁস-মুরগির গুগলি, শামুক সংগ্রহ করা, ঘাস কাটা, থালাবাটি মাজা-ধোঁয়া, ছোটখাট কাঁথাকাপড় ধোওয়া, তরকারি কোটা বাছা, রান্নায় সাহায্য করা ইত্যাদি। এই সব কাজ অল্প অল্প করে শুরু করে আরো কম বয়সী শিশুরা। কারণ অধিকাংশ পরিবারে ৫/৬ বছর বয়সী শিশুর ছোট ভাইবোনের জন্ম হয়েছে যার জন্য তারা মায়ের, বাবার কোল খালি করে

www.amarboi.org

দিয়েছে। এই ছোট ভাইবোনের দেখাশোনার কাজও তাকে অতি কম বয়সে শুরু করতে হয়। এভাবে সে কর্তব্য কাজের ভার কাঁধে তুলে নেয় এবং তার প্রাপ্য শৈশবকালীন যত্ন, আদর, স্নেহ হারিয়ে ফেলে এবং সমাজ ও সংসারের চোখে হয়ে ওঠে ছোটখাট বয়স্ক মানুষ। এ সময় দায়িত্ব থেকে যে কোনো বিচ্যুতি, ভুলভ্রান্তি, অবহেলা কঠোর ভাবে গ্রহণ করা হয় এবং শাসনের নামে, আচার-ব্যবহার, কাজ শেখানোর নামে ওই শিশুর উপর নেমে আসে কঠোর দৈহিক শাস্তি, ভর্ৎসনা, অন্যায় তুলনা যার মাধ্যমে শিশু ধীরে ধীরে শিশু নিজেই নিজের সম্পর্কে দুর্বল ধারণা গড়ে তোলে। বাবা মা ও বড়দের উদাসীনতা, গালমন্দ, দৈহিক শাস্তির ফলে লক্ষ লক্ষ শিশু নিজের ক্ষমতা বা যোগ্যতা সম্পর্কে দুর্বল ধারণা গড়ে তোলে এবং লেখাপড়া, স্কুলে কাজে উৎসাহ, প্রেরণা উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলে হয় স্কুলের পরীক্ষায় ফেল করে নতুবা নিম্নমানের দুর্বল শিক্ষা গ্রহণ করে স্কুলশিক্ষা শেষ করে, যা তাকে কোনোক্রমেই ভবিষ্যতের ভালো উপার্জনের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। বড় হয়ে সে এমন একটি জীবিকা নিয়ে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয় যা তাকে তার ভবিষ্যৎ জীবনে পরিবারের সদস্যদের জন্য স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, পর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে অক্ষম করে রাখে। এভাবে তাদের সন্তানেরাও কম বয়সে রোগে ভুগে নিচুমানের শিক্ষা গ্রহণ করেই একই দুষ্টচক্রে বাঁধা পড়ে। এ দুষ্টচক্রকে ভেঙ্গে ফেলা সম্ভব হবে যদি যথোপযুক্ত বয়সে পরিকল্পিত লালন-পালন কৌশল গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

শিশুর প্রতিরক্ষা

শিশুর প্রতিরক্ষা বলতে বোঝায় এক বছর বা পাঁচ বছর পূর্ণ হবার পূর্বে শিশুর মৃত্যু না হওয়া। এই কার্যক্রমে শিশুর মৃত্যুর কারণ ছয়টি শৈশবকালীন রোগের টীকা দিয়ে প্রতিরোধ করায় নিয়োজিত থাকা এবং এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য থাকে Infant Mortality Rate (IMR) এবং Under Five Mortality Rate (U5MR) হ্রাস করা। কিন্তু মৃত্যু একটি চলমান প্রক্রিয়া, যার মধ্যে নিহিত আছে রোগ ভোগের দীর্ঘ অথবা স্বল্পকালীন যন্ত্রণা। বেঁচে থাকাও একটি প্রক্রিয়া যার লক্ষ্য শুধুমাত্র শিশুর জীবন রক্ষা নয়, বরং তার দৈহিক মানসিক এবং সামাজিক বৃদ্ধি বা বিকাশ এবং মানসিক ও দৈহিক সুস্থতা।

শিশুর বৃদ্ধি

আকারে বেড়ে ওঠাকে বৃদ্ধি বলা হয়। দেহকোষের বৃদ্ধি বা দেহকোষ বড় হতে হতে দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে। সাধারণত শিশুর বয়স অনুযায়ী ওজন ও উচ্চতা

www.amarboi.org

পরীক্ষা করে শিশুর দেহের বৃদ্ধি পরিমাপ করা হয়ে থাকে। ধীর বৃদ্ধি সাধারণত উন্নতি ইঙ্গিত করে। বৃদ্ধি ঠিক সময় ঠিকমত না ঘটলে বা বাধাগ্রস্ত হলে সেক্ষেত্রে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। শিশুর দৈহিক বৃদ্ধির পাশাপাশি আজকের দিনে শিশুর মানসিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যদিও দৈহিক বৃদ্ধি ভালো খাবার পাওয়ার ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, খাওয়ানোর প্রক্রিয়া বা কে, কিভাবে, কি কথা বলে খাওয়াচ্ছে সে সামাজিক প্রক্রিয়াটি শিশুর সামাজিক আবেগিক বিকাশের জন্য বেশি প্রয়োজনীয়। এই খাওয়ানোর সময় শিশুর সাথে মা, বোন, বাবা বা অন্য যত্নকারী ও শিশুর মধ্যে যে ভাবের ও কথার আদান-প্রদান ঘটে তা শিশুর সামাজিক, আবেগিক ও মানসিক বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ কারণে খাদ্যের পরিমাণ ও গুণগতমান যেমনই হোক, শিশু কিভাবে খাদ্য গ্রহণ করছে তা আরও গুরুত্বপূর্ণ। দেখা যায়, খাদ্য সে শিশুই বেশি গ্রহণ করতে পারে যে শিশু সুস্থ ও সবল স্বাস্থ্যের অধিকারী। বলা বাহুল্য যে, একজন ডায়রিয়া আক্রান্ত শিশু একজন সুস্থ শিশুর সমান খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না, সে খাদ্য হজমও করতে পারে না। আরও গুরুত্বপূর্ণ, যে শিশু সামাজিক ও মানসিকভাবে সুস্থ, যে কোনো মানসিক চাপের মধ্যে থাকে না, তার পক্ষে খাদ্য পরিমাণমত গ্রহণ যেমন সম্ভব, তেমনি তা হজম করে শরীরের কাজে লাগাতেও বেশি সক্ষম।

শিশুর বিকাশ

শিশুর জন্ম মুহূর্ত থেকেই শুধু যে বেঁচে থাকার জন্য যুদ্ধ করে তা নয়, প্রতি মুহূর্তে তার দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আবেগিক ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটে চলেছে। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, শিশুর মগজের গঠন, যার ওপর বুদ্ধি এবং অন্যান্য বিকাশ নির্ভর করে তা দুই বছর বয়সের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। সুতরাং তাকে বেশ কম বয়স থেকেই যদি উৎসাহব্যঞ্জক, প্রেরণামূলক খেলা, কাজ করানো যায়, তাহলে তার সব ক্ষেত্রে দ্রুত বিকাশ ঘটা সম্ভব। সুতরাং বয়সভিত্তিক বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ এবং তার সামাজিক-আবেগিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন যথাযথ, উৎসাহব্যঞ্জক, অনুপ্রেরণাদায়ী, উদ্দীপক খেলা ও কাজকর্ম, নতুবা সঠিক বয়সে সঠিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। পরিণতিতে শিশু প্রতিবন্ধী হয়ে বেড়ে ওঠে। শিশুর বয়সভিত্তিক বৃদ্ধি, হাসা, শোনা, ধরা, উপুর হওয়া, বসা, দাঁত ওঠা, শব্দ করা, শব্দ বলা, হাঁটা ইত্যাদি বিকাশগুলি শিশুর মৌলিক বিকাশ, যার ওপর ভিত্তি করে শিশু সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠে। শিশু একটি ধাপ পার হলে পরের ধাবে পৌঁছার

www.amarboi.org

আগে তার প্রস্তুতি দরকার। শিশু স্বাভাবিক গতিতেই এই প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কিন্তু মা-বাবা, শিশুর যত্নকারীরা প্রতি ধাপে পৌছার আগে শিশুকে উদ্দীপনাদানকারী কাজ ও খেলার মাধ্যমে তার এই পরবর্তী ধাপে পৌছার কাজটি সহজতর করে দিতে পারে। এভাবে শিশুর বিকাশকে মা, বাবা, দাদি-নানি, বড় ভাইবোন শিশু যত্নকারীরা এবং শিশুর দিবাযত্ন কেন্দ্রের আয়া বা শিশু যত্নকারী, শিশুশ্রেণির শিক্ষিকারা শিশুর বিকাশের বিভিন্ন দিকগুলোতে উপযুক্ত ও সময়োপযোগী বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে কাজ করতে পারে। আমাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে আমরা সচেতনভাবে শিশু ও যত্নকারীর মধ্যে নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে অনেক সাহায্য করে থাকি। যেমন প্রথমেই আমরা সদ্য জন্মানো শিশুর সাথে চোখে চোখ মিলিয়ে কথা বলতে থাকি, চোখের মুখের নানা ভঙ্গি করি, গান শুনাই, ছড়া বলি- এসব কিছুই শিশুকে তার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সাথে দ্রুত পরিচিত করে তোলে, শব্দ, বাক্য, ভাষা সম্পর্কে পরিচিত করে। যার ফলে সে দ্রুত নিজ ভাষা আয়ত্ত করে। এছাড়া শিশুকে বসতে পারার আগে বালিশ দিয়ে বসানোর অভ্যাস করানো, হাঁটার আগে কিছু ধরে ধরে হাঁটার অভ্যাস করানো, হাত ধরে ধরে, হাঁটি হাঁটি পা পা করে হাঁটা শেখানো হয়। শিশুর বয়সোপযোগী দৈহিক বিকাশের জন্য এসব প্রয়োজনীয় চর্চা আমরা সহজাত ভাবেই করে থাকি। আমরা শিশুকে আমাদের খাবারের অংশ ভাগ করে দেই শিশুর বড় ভাইবোনেরা শিশুকে ফেলে কিছু খায় না, দরিদ্র পরিবারেও সামান্য খাদ্য সবাই ভাগ করে খায় এ থেকে শিশু নিজের অংশ অন্যের সাথে ভাগ করে খেতে শেখে এবং তা করতে ভালোবাসে। শিশু কিছু করলে, যেমন, হাঁটতে পারলে, খাবারের অংশ দিলে আমরা প্রসংশা করি, কোনো কিছু এনে দিলে, এগিয়ে দিলে প্রশংসা করি। বাহবা দেই। একথা অনস্বীকার্য যে, প্রশংসা, বাহবা বয়স নির্বিশেষে সবাইকে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করে এবং একথা বলা বাহুল্য যে, প্রশংসার ফলে শিশু কিশোর যে কেউ কঠিন কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। প্রশংসা করে একজন অনিচ্ছুক শিশুকে দিয়ে অনেক কঠিন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করানো যায়। এর পাশাপাশি মারধর, গালমন্দ, দোষ ধরা একজন শিশুকে বিদ্রোহী করে তোলে।

শিশুর বিকাশ ও যত্ন সম্পর্কিত আধুনিক ধ্যান-ধারণা

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিক্ষা সম্পর্কিত কতগুলো সমস্যা দেখা দিয়েছে যা গভীরভাবে নিরীক্ষা করার পর বিশেষজ্ঞ বা শিক্ষাবিদ, শিক্ষা পরিকল্পকদের কাছে প্রতিভাত হয়েছে যে, শিশু যদিও নানা রকমের আচার কৌশল, রীতি-নীতি যত্ন, স্নেহ ভালোবাসার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে বলে মনে করা হয়। তবু

www.amarboi.org

খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায় যে এর মধ্যে অনেক রীতিনীতি কৌশল রয়েছে বা বয়স্করা শিশুদের প্রতি এমন অনেক আচরণ করেন যা তাদের ভেতর সুপ্ত গুণ বিকশিত হতে বাধা দান করে। অনেক সময় শিশু নিজ ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে কর্মক্ষেত্রে বা অন্য যেকোনো সৃজনশীল ক্ষেত্রে নিজস্ব ক্ষমতা প্রকাশ করতে অক্ষম হয়। অনেক সময় অন্য সমবয়সীদের চেয়ে পিছিয়ে পড়ে। এই সমস্ত অক্ষমতা, আস্থাহীনতা, উদ্যোগহীনতা তাকে এমন এক পিছিয়ে পড়া অনুন্নত জীবনের দুষ্টচক্রে বন্দি করে ফেলে যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে এবং যা তাকে বংশ, পরম্পরায় অনুন্নত জীবনে বন্দি করে রাখে।

এ ছাড়া আরও গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো সমস্যা শিশুর শিক্ষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে যা শিক্ষার গুণগতমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং শ্রেণি থেকে ঝরে পড়া, ফেল করা ইত্যাদির হার বাড়িয়ে দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার বিপুল ক্ষতিসাধন করে, বহু অর্থ, ছাত্র-শিক্ষকের সময়ের অপচয় সাধন করে। এর অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা যায়-যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী আসে অসুবিধাগ্রস্ত পরিবার থেকে, যারা বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য কোনোরকম পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে আসে না, যাদের বাবা-মা নিরক্ষর, পরিবারে সাক্ষরতা চর্চার কোনো সুযোগ বা উপাদান থাকে না, তারা বিদ্যালয়ে সাক্ষর পরিবারের শিশুদের পাশাপাশি একটি অসম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়। এই প্রতিযোগিতায় তারা বাড়ির এবং স্কুলের শিক্ষকদের সহযোগিতা না পাওয়ায় এবং উপযুক্ত পূর্বপ্রস্তুতি না থাকায় সে বিদ্যালয় ভিত্তিক দক্ষতা ও জ্ঞান গ্রহণ করতে অপারগ হয়। ফলে সে অকৃতকার্য হয়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করে। এই শিশুদের সফলভাবে শিক্ষা সম্পন্ন করার জন্য উপযুক্ত সহযোগিতা প্রদান প্রাথমিক শিক্ষার সফলতার হার বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে ইতিবাচক এবং অর্থপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে। বিভিন্ন দেশে গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে, যে সব শিশু পূর্ব প্রস্তুতিমূলক শ্রেণিতে পড়াশুনা, খেলাধুলার সুযোগ লাভ করেছে তাদের অধিকাংশই পরবর্তী স্কুল শিক্ষা সম্পন্ন করেছে, খুব কমই বিদ্যালয় ত্যাগ করেছে। এই হার মেয়ে শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি।

এ প্রসঙ্গে শিশুর শৈশবকালীন যত্ন ও বিকাশ কার্যক্রমের কতগুলি তাৎপর্যপূর্ণ উপকারিতা আলোচনা করা যায়।

১. শিশুর বিকাশ বহুমুখী-শিশুর দৈহিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দৈহিক বিকাশের স্থূল ও সূক্ষ্ম পেশীর সমন্বয় করতে পারা। এটি শিশুর বিকাশের অন্যতম প্রধান একটি ধাপ। এছাড়া তার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ অন্যতম, যা শিশুকে চিন্তা করতে এবং যুক্তিপূর্ণ আচরণ করতে সাহায্য করে। আবেগিক

www.amarboi.org

বিকাশ অন্যতম প্রধান একটি ক্ষেত্র যা মানুষকে নানারকম অনুভূতি অনুভব করতে শেখায়। সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে মানুষ নিজেকে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করতে শেখে, মিলেমিশে কাজ করতে সক্ষম হয়। এগুলি প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ এবং কোনোটিই অন্যটির চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

২. শিশুর বিকাশের প্রতিটি ক্ষেত্র পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, শিশুর দৈহিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। যথোপযুক্ত, বয়সোপযোগী দৈহিক বিকাশ না ঘটলে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে সামাজিক ও আবেগিক বিকাশের ক্ষেত্রে, ফলে সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। বুদ্ধির বিকাশ ঠিকমত না হলে শিশুর আবেগিক-সামাজিক বিকাশ যথোপযুক্ত হয় না এবং আচরণ সামাজিক ভাবে গৃহীত হয় না।

৩. ধারাবাহিক বিকাশ- মায়ের গর্ভ থেকে শিশুর বিকাশ শুরু হয়ে চলে সারাজীবন। শিশুবিকাশ থেকে ক্রমশ এটি মানব বিকাশে পরিণত হয় এবং সারাজীবন ধরে সব ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে এই বিকাশ ঘটতে থাকে। কিন্তু শিশুর যত্ন ও বিকাশের পর্যায়টি ভ্রূণ থেকে পাঁচ বা ছয় বছর পর্যন্ত বয়সকে ধরা হয় যখন শিশু আস্তে আস্তে বাড়ির বাইরে যেতে শুরু করে, শিশুশ্রেণি বা প্রথম শ্রেণিতে ভরতি হয়ে স্কুলে প্রবেশ করে অথবা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে প্রবেশ করে। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ হলো এই যে, শৈশবের অভিজ্ঞতা, নানারকম উদ্দীপনা ও কৌতূহল, খেলাধুলা, কাজ, সুযোগ মানুষের পরবর্তী বয়স্ক জীবনে আচার-আচরণ, কৃতিত্ব অর্জন এবং সার্বিক বিকাশকে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ শৈশবের উপযুক্ত বিকাশ বয়স্ক অবস্থার ইতিবাচক বিকাশকে নিশ্চিত করে। একটি মুহূর্তে যা ঘটে গেল তার ওপর নির্ভর করে ভবিষ্যতের কোনো ঘটনার জন্য শিশু প্রস্তুত হয়। এর মধ্যে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, শিশু শৈশবে ধীরগতি সম্পন্ন হয়, সবকিছু ধীরে ধীরে শেখে এবং নানারকম সমস্যায় ভোগে। সে যে ভবিষ্যতেও তাই থাকবে তা নয়, ভবিষ্যতে সে দ্রুতগতি সম্পন্ন অগ্রগতি দেখাতে পারে এবং খুবই সফল জীবনের চাবিকাঠি, উন্নত জীবিকা অর্জন করতে পারে। তবে সমস্যায় ভোগা শিশুর পরিবেশের যদি পরিবর্তন না ঘটে, দক্ষতা অর্জনের সহায়ক পরিবেশ যদি সে লাভ না করে, তবে সে শুধু নিজ চেষ্টায় উন্নতি লাভ নাও করতে পারে।

৪. বিভিন্ন রকম ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর বিকাশ-শিশুর বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে ব্যবহার করে তার নিকট পরিবেশকে দেখে, শুনে, শুঁকে, ধরে,

www.amarboi.org

অনুভব করে, ধারণা লাভ করে, এভাবে মানুষ বা বস্তু বা প্রাণী সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা হয়, তাদের বৈশিষ্ট্য জানে, তাদের সঙ্গে আচরণ করতে শেখে বা তাদেরকে ব্যবহার করতেও শেখে। সঠিক সময় সঠিক উদ্দীপনা যোগানো গেলে দেখা যায় শিশু ঠিকমত বিকাশ লাভ করে। শিশুর গৃহীত নতুন কোনো উদ্যোগের প্রতি বড়দের যথার্থ প্রতিক্রিয়াও শিশুর বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিশু কোনো না কোনোভাবে তার পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে নিজের পক্ষে নিয়ে আসে। এতে সফল হলে তার বিকাশ পূর্ণত্ব লাভ করে। এভাবে তার স্বাস্থ্য ও পুষ্টিমান তার মানসিক ও সামাজিক বিকাশকে প্রভাবিত করে, তার দৈহিক বিকাশের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

৫. শিশুর বিকাশ রীতিবদ্ধ। কিন্তু প্রত্যেক শিশুর বিকাশ অনন্য ও অদ্বিতীয়। শিশুর বেড়ে ওঠার ধাপগুলি রীতিবদ্ধ এবং বিশ্বজনীন। সারা পৃথিবীতে শিশুরা প্রায় একই বয়সে হাসে, আলো দেখে, কিছু ধরে, উপুর হয়, বসে, হাঁটতে শেখে। এ কাজগুলোতে শিশুরা কেউ কেউ দ্রুত, কেউ কেউ ধীর। প্রত্যেকটি শিশুই তার নিজস্ব দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশের প্রভাবে নিজস্ব গতিতে বিকশিত হয়। এক শিশুর বিকাশের ধারার সাথে তাই অন্য শিশুর বিকাশের ধারার মিল নেই। তাছাড়া কোনো শিশু তাড়াতাড়ি হাঁটা শেখে আবার কোনো শিশু না হেঁটে কথা বলতে শেখে আগে। কোনোটিই দোষের নয়, দুজন দুভাবে বিকশিত হচ্ছে। দেখা যায়, এক একজন শিশু এক এক ধরনের আচরণ করে, কেউ মা-বাবার বকুনি গায়ে মাখে না, কেউ সামান্য বকুনিতে খুব অপমান বোধ করে, কোনো শিশু বাবা-মায়ের কাছে থাকতে চায়, কেউ আবার সমবয়সীদের সাথে খেলতে পছন্দ করে, কেউ কেউ বায়না ধরে, ঘ্যান ঘ্যান করে, বেশি কান্নাকাটি করে। মা-বাবা বা শিশু যত্নকারীকে এর কারণ বোঝার চেষ্টা করতে হবে, কেন, কোথায় শিশুর অসুবিধা হচ্ছে। আসল কথা হচ্ছে, পার্থক্য সত্ত্বেও অথবা সব ভিন্নতা সত্ত্বেও শিশু তার নিজস্ব পরিবেশের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করবে, নিজেকে তার সাথে মানিয়ে নিতে পারবে, দরকার হলে পরিবেশকে বদলে নিয়ে ব্যবহার করতে শিখবে।

শিশুর যত্ন বা পরিচর্যা

যেসব কাজের মাধ্যমে শিশুর জীবনরক্ষা, দৈহিক বৃদ্ধি এবং সামাজিক-মানসিক বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটে তাই শিশুর যত্ন বা পরিচর্যা। শিশুর সেবা যত্ন অর্থ শুধুমাত্র জীবনরক্ষা, খাদ্য, স্বাস্থ্য সেবা নয় বরং স্নেহ-ভালোবাসা ও উদ্দীপনা

www.amarboi.org

প্রদান, মানসিক নিরাপত্তা এবং খেলাধুলার মাধ্যমে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার বিষয় আবিষ্কার করার সুযোগ নিশ্চিত করা। শিশুযত্নে অন্তর্ভুক্ত আছে নিরাপত্তার ব্যবস্থা, আশ্রয়, বস্ত্র, খাদ্য, গোসল, পেশাব-পায়খানা করানো, রোগের হাত থেকে রক্ষা এবং সেবা করা, স্নেহ-ভালোবাসা প্রদান করা, উদ্দীপনা জোগানো, খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্ম, উৎসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা। সুতরাং শিশুর যত্ন সবক্ষেত্রের বিকাশের সমন্বিত একটি রূপ। তবে শিশুর যত্ন বিভিন্ন সেবাদানকারী দলের কাছে, বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের কাছে সেবা ও চিকিৎসা প্রদান। একইভাবে মা ও শিশুমঙ্গল কর্মসূচি বাস্তবায়নকারীদের কাছে এটি গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্যসেবা এবং ভ্রূণের যত্ন এবং ছোট শিশুর স্বাস্থ্যসেবা। মা যখন কর্মক্ষেত্রে তখন শিশুযত্ন বলতে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের পরিচালকদের কাছে শিশুকে সারাদিন দেখাশোনা করার কাজ হিসাবে পরিচিত হয়।

শিশুর যত্ন ও বিকাশের প্রধান ধারণা ও সুবিধা

গবেষণায় দেখা গেছে যে, শিশুর মগজের বৃদ্ধি ও পরিণতি তার দুই বছর বয়সের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যায় এবং শিশুর মগজের বিকাশের ওপর নির্ভর করে তার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ, তার শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা। সুতরাং শিশুর মগজ গঠনের সময়ে যথোচিত উদ্দীপক কাজকর্ম করিয়ে তার বুদ্ধির চর্চার সুযোগ প্রদান না করলে তার বুদ্ধির পরিপূর্ণ বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়ে যায়। এ কারণে আজকাল ০-৫/৬ বছরের শিশুদের নানারকম বুদ্ধির চর্চার সুযোগ দেয়া, পরিবেশকে চেনার, বোঝার, ব্যবহারের বিভিন্নমুখী অভিজ্ঞতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা, ছোট ছোট সমস্যার সমাধান করে সহজ থেকে জটিল আচরণ করতে শেখানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। এর ফলে দেখা যায়, শিশুর বুদ্ধি ও মানসিক বিকাশ এতটা পূর্ণতা লাভ করে যে সে সহজে বিদ্যালয়ের নতুন পাঠ, দক্ষতা ও জ্ঞান গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ এটি শিশুকে এমন এক ধরনের পূর্ব প্রস্তুতি প্রদান করে যা সাক্ষর পরিবারের শিশুরা তাদের বাবা-মায়ের সাহায্যে লাভ করে এবং এ কারণে তারা বিদ্যালয় শিক্ষায় সহজে প্রবেশ লাভ করে এবং সফলতা অর্জন করে। এই প্রাক-শৈশব বিকাশ ও যত্নের কার্যক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন দেশে গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে-

ক. যেসব শিশু এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তারা বিদ্যালয় শিক্ষা সফলভাবে গ্রহণ করতে পারে বলে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হার, অকৃতকার্য শিশুর হার কমে যায়। সুতরাং বিদ্যালয় শিক্ষার অর্থব্যয়

www.amarboi.org

অনেক বেশি অর্থপূর্ণ ও লাভজনক হয়ে ওঠে। ঝরে পড়া ও অকৃতকার্য হওয়ার মাধ্যমে যে অহেতুক অপচয় হয় তাও অনেকাংশে কমে যায়।

খ. গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে, পূর্বপ্রস্তুতিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করে শিশুরা বিদ্যালয়ে টিকে থাকে, শিক্ষা সমাপ্ত করে বিশেষত মেয়েরা যারা এই ধরনের পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করেছে তারা পড়াশোনায় অন্যদের তুলনায় বেশি টিকে থাকে। এভাবে দারিদ্র্য এবং নারী-পুরুষ বৈষম্যের প্রভাবকে বদলে দেওয়া যায়, শিক্ষার সুযোগ ও সফলতাকে সবার জন্য সমান করে তোলা যায় এবং এভাবে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা যায়।

গ. শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে বা বাড়িতে এ ধরনের কর্মসূচির প্রভাবের ফলে স্বাস্থ্যসেবামূলক খাতে ব্যয় কমে ও মা-বাবারা কেন্দ্রের শিশু যত্নকারী শিশুর উপযুক্ত যত্নের জন্য নিজেদের জ্ঞান, দক্ষতা বৃদ্ধি করে বলে বাড়িতে ও কেন্দ্রে শিশুর বিকাশ সুসমন্বিতভাবে ঘটে থাকে।

ঘ. স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, নারী উন্নয়নমূলক কর্মসূচির কার্যকারিতা অনেক বৃদ্ধি করা যায়, যদি এগুলোর সঙ্গে শিশু বিকাশ কর্মসূচি সংযুক্ত করা যায়। শিশুরা সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে এক লক্ষ্যমুখী করে যা সমাজে ঐক্যমত্য এবং সংহতি তৈরি করে। এ বিষয়ে পুরুষকে নারীর সমর্থনে ও সাহায্যে অতি সহজে পাওয়া যায়।

ঙ. পরিবর্তনশীল সমাজে শিশুদের বেঁচে থাকার হার বৃদ্ধি, পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তন, গ্রাম-নগর চলাচল, শ্রমশক্তিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ, শিশুর বিকাশ ও যত্ন কার্যক্রমের গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। শিশুযত্ন কেন্দ্রে মা শিশুকে নিরাপদে রাখতে পারলে তার কাজের মান উন্নত হয়, সে গুণগতমানের কাজ পরিমাণেও বেশি করতে পারে, যার সম্মিলিত সুফল লাভ করে সমাজ ও দেশের দ্রুত উন্নয়ন ঘটে।

উপসংহার

শিশুকে লক্ষ্যদল হিসাবে টার্গেট করে অতি সহজে নারীর মর্যাদা ও অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব। এছাড়া স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা, সব কিছুকে একীভূত করে শিশুকে টার্গেট করে কর্মসূচি প্রণয়ন করলে তার বাস্তবায়ন সহজসাধ্য হবে, ব্যয় কম হবে সমাজের উপকার বা সুফল বেশি হবে।

www.amarboi.org

শিশুর বিকাশ এবং ভালো মা-বাবা হওয়ার শিক্ষা

সাংস্কৃতিকভাবে বাঙালি মা-বাবা হতে ভালোবাসে। ছোট শিশু প্রায় সব বয়সের মানুষের কাছে আদরের। একদল নানা বয়সী মানুষের মধ্যে ছোট্ট একটি শিশু সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমনকি আমাদের দেশে ছোট শিশু মা-বাবা হারিয়েও অন্যান্য আত্মীয়ের কাছে প্রায়ই আদর-স্নেহের মধ্যেই বড় হয়। অনাদর যে হয় না তাও নয়, তবু দেখা যায় দাদা, দাদি, নানা, নানি, চাচা, চাচি, মামা, মামি, খালা, ফুপু এমনকি প্রতিবেশীর বাড়িতেও ছোট শিশু সবার মনোযোগ কাড়ে। সাধারণত ছোট শিশু যখন একটু বড় হতে হতে নানারকম দুরন্তপনা করে, কোনো কারণে মেজাজি, জেদি হয়ে ওঠে, তখন থেকে সে আস্তে আস্তে বড়দের কাছে মনোযোগ ও আদর হারিয়ে ফেলে। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে স্বাভাবিক নিয়মে সমাজ খুব দ্রুতই তার কাছে কাজ ও কর্তব্য আশা করতে, কখনো দাবি করতে শুরু করে। এখানেই একটি ট্র্যাজেডি ঘটে। শিশুকে সত্যিকারের কাজ ও কর্তব্য করার মত বড় হতে যে সময় দেওয়া দরকার তা দেওয়া হয় না এবং সমাজ ও দরিদ্র পরিবারের অভাব ও প্রয়োজনের বিশাল গ্রাসের ভেতর শিশুর কাছ হতে অতি দ্রুতই তার প্রাপ্য আদর-স্নেহ, খেলাধুলায় ভরা শৈশব প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। সাধারণ দরিদ্র, অসুবিধাগ্রস্ত পরিবারে সাত/আট বছরের শিশুর কাঁধে যে কর্তব্যের ভার চাপিয়ে দেওয়া হয় তা এক নজরে এরকম- ছোট ভাইবোনের দেখাশোনা, পানি আনা, জ্বালানি-লাকড়ি-গোবর সংগ্রহ, ঘর-উঠান ঝাড়ু দেওয়া, ঘরের গৃহপালিত পশু-পাখি থাকলে তাদের খাওয়ানো, দেখাশোনা করা, ক্ষেত থাকলে তাতে পানি দেওয়া, আগাছা তোলা, মা-বাবাকে তাদের জীবিকার কাজে সাহায্য করা, দোকানে কেনাকাটা করা, কোনো উৎপন্ন দ্রব্য বেচা, হাঁস-মুরগির গুগলি-শামুক সংগ্রহ করা, ঘাস কাটা, গরু-ছাগল চরানো, থালাবাটি, হাঁড়ি-পাতিল মাজা-ধোয়া, ছোটখাট কাঁথা-কাপড় ধোয়া, তরিতরকারি কোটা, চাল বাছা ইত্যাদি। এ সময় থেকে যেন শিশু তার শৈশবকালীন পাওনা স্নেহ-আদর-যত্ন হারিয়ে ফেলে সমাজ ও সংসারের চোখে হয়ে ওঠে ছোটখাট বয়স্ক মানুষের প্রতিনিধি। তার যে কোনো বিচ্যুতি, দায়িত্ব-কর্তব্য ভুল-ভ্রান্তি কঠোরভাবে গ্রহণ করা হয় এবং শাসনের নামে শিশুকে সামাজিক আচার-

www.amarboi.org

আচরণ, ব্যবহার, অভ্যাস, কাজকর্ম শেখানোর নামে যে উপায়গুলো ব্যবহার করা হয় তা প্রধানত: চর-থাপ্পর মারা, চেঁচিয়ে ধমক দেওয়া, শিশুকে ছোট করে কিছু বলা, লজ্জা দেওয়া, গালি দেওয়া, অন্যের সাথে তুলনা করা, শাসানো, ভয় দেখানো ইত্যাদি।

মজার ব্যাপার এই যে, শিশু ভুল করলে বয়স্করা তা সহজভাবে কখনো নেন না। যেমন, কোনো বয়স্কের কোলে ছোট শিশু কাঁদলে তার কোন কৈফিয়ৎ বয়স্ককে দিতে হয় না। অথচ শিশু যত্নকারী শিশুকে একই কারণে মারধর খেতে হয়, গালাগাল শুনতে হয়। একজন বয়স্ক একটি গ্লাস ভাঙলে তা হয় দৈবাৎ দুর্ঘটনা আর শিশুদের শুনতে হয় অনেক কথা, অসতর্কতার জন্য অনেক উপদেশ।

সাধারণত দেখা যায় গালাগালি, সমালোচনার মধ্যে শিশু সমালোচক হিসাবেই গড়ে ওঠে, মারধর খেয়ে শিশু বড় হয়ে নিজের সন্তানের সাথেও একই আচরণ করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। বিপরীতে শিশুকে আদরের সাথে বুঝিয়ে নতুন কোনো অভ্যাস শেখালে, আদরের সাথে ভালবেসে তার খারাপ আচরণ শোধরাতে বললে, মা-বাবা তার কাছ থেকে কী চান তা পরিষ্কার করে তাকে বুঝিয়ে বললে সেই শিশু সুস্থ, স্বাভাবিক, শান্ত, ধীরস্থির হয়ে বেড়ে ওঠে। এ কথা বলা বাহুল্য যে, আমরা বয়স্করা আমাদের কাছ থেকে কেউ কোনো কাজ চাইলে তা মিষ্টি স্বরে, অনুরোধের সুরে বললে খুশি হই, খুশি হয়ে দশগুণ কাজ করে ফেলি। শিশুদের বেলাতেও তা প্রযোজ্য হবে না কেন? দেখা যায়, শিশুকে সমালোচনার মধ্য দিয়ে তার নিজ ক্ষমতা সম্পর্কে একটি গণ্ডি বেঁধে দেয় বয়স্করা। ফলে শিশুর আত্মধারণা হয়ে পড়ে সীমাবদ্ধ, সে নিজেকে গণ্ডিবদ্ধ করে ফেলে এবং নিজেই ধরে নেয়-'আমি অঙ্কে কাঁচা', 'আমি পড়াশোনায় ভালো না', 'আমার মাথায় গোবর আছে', 'আমি ধীর', 'আমি অপদার্থ' ইত্যাদি ইত্যাদি। দেখা যায় বয়স্কের এসব মতামত এমন প্রভাব বিস্তার করে যে, শিশুর স্কুলের ও ঘরের পড়াশোনার এবং কাজের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়। এসব সমালোচনা শিশুর দক্ষতার বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে রাখে।

এ বিষয় ছাড়াও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে শিশু বয়স্ক বা তার মা-বাবার উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। জন্মের পর থেকে শিশুর বয়স অনুযায়ী দৈহিক বিকাশ ঘটছে কি না, তা লক্ষ্য করার দায়িত্ব তার মা-বাবার। বয়স অনুযায়ী একটি শিশু ঠিক সময়ে হাসছে কি না, আলোর দিকে মাথা ঘুরিয়ে দেখছে কি না, শব্দ শুনে ঘাড় ফেরায় কি না, উপুর হয় কি না, হাত বাড়িয়ে কিছু ধরে কি না, শব্দ করে কি না, হামাগুড়ি দেয় কি না, দাঁত উঠছে কি না, হাঁটছে কি না,

www.amarboi.org

কথা বলছে কি না ইত্যাদি সহজ থেকে জটিল কাজ ও আচরণগুলো শিশু আয়ত্ত করছে কি না তার পর্যবেক্ষক হচ্ছে শিশুর মা-বাবা। অল্প বয়সে কোনো ক্ষেত্রে ত্রুটি দেখা দিলে তা যথোপযুক্ত অনুশীলনের মাধ্যমে, ডাক্তারের সাহায্যে অতি সহজে দূর করা সম্ভবপর নতুবা পরে স্থায়ী ত্রুটি হয়ে প্রতিবন্ধিতার জন্ম দিতে পারে।

শিশু পালনের এসব বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে সম্প্রতি পৃথিবীর অনেক শিশু বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও জাতিসংঘের ইউনিসেফসহ বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের সহযোগিতায় শিশুর সুষ্ঠু বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিশু পালনের কতগুলো মূল বাণী চিহ্নিত করেছেন যা Facts For Life গ্রন্থের শিশুর বিকাশ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। ছোট শিশুর সুষ্ঠু, সুস্থ বিকাশের জন্য এ বাণীগুলো খুবই গুরুত্ব বহন করে।

- খাদ্য ছাড়াও স্নেহ ও যত্ন শিশুর জন্য প্রয়োজনীয়
- শিশুর মাতা-পিতাই শিশুর বিকাশের শ্রেষ্ঠ পর্যবেক্ষক
- প্রশংসা শারীরিক শাস্তির চেয়ে বেশি কাজ করে
- শিশুরা খেলাধুলার মধ্য দিয়ে শেখে
- পরিবার শিশুর প্রথম বিদ্যালয়
- মা-বাবার ধৈর্য ও মনোযোগ হচ্ছে ভালো ও সুস্থ শিশুর শর্ত।

এই বাণীগুলোতে যে বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করেছে তা হচ্ছে, মা-বাবার আদর, যত্ন, মনোযোগ এবং মা-বাবার আচরণ। শিশু তখনি আদর যত্নে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে বড় হবে যখনি শিশু মা ও বাবার মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ দেখতে পাবে। ছোট শিশুর সুস্থ ভাবে বেড়ে ওঠার জন্য তার মানসিক খাদ্য-আদর স্নেহ-মমতা, মনোযোগ কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিলাসব্যসনে বড় হয়েও শিশু মা-বাবার আদর-যত্ন-মনোযোগের অভাবে ভারসাম্যহীন অসুস্থ ব্যক্তিত্ব নিয়ে বড় হয়ে ওঠে। শাস্তি, মারধর, হুমকি, গালাগাল শিশুকে ভারসাম্যহীন করে তোলার জন্য দায়ী। বিপরীতে প্রশংসা, উৎসাহ, আদর, যত্ন, ভালোবাসা ম্যাজিকের মত কাজ দেয়। ফলে শিশুর মন দ্রুত বিকশিত হয় এবং শিশু মা-বাবাকে, শিক্ষককে খুশি করার জন্য নিজের সব ক্ষমতাকে ব্যবহার করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সীমিত কিন্ত সহজ শাস্তিমূলক আচরণ করা যায় যখন শিশু সহজে বসে থাকছে না। এরূপ ক্ষেত্রে শিশুর কোনো প্রিয় জিনিষ, খাদ্য বা খেলা কিছুক্ষণের জন্য প্রত্যাহার করা যেতে পারে। এমনকি মা কথা বন্ধ, খেলা বন্ধ করতে পারেন, গল্প বলা বন্ধ করতে পারেন। এসব শাস্তিমূলক আচরণ ভালো কাজ দেয়।

www.amarboi.org

শিশুকে বেশি সময় ধরে খেলার সুযোগ দিতে হবে। খেলতে খেলতে শুধু যে শিশু পরিবেশকে চেনে, জানে, বোঝে তা নয় সে পরিবেশে উদ্ভূত নানা সমস্যার সমাধান করতে শেখে নানারকম খেলা খেলে। সে অনেকের সাথে খেলে সামাজিক হয়ে ওঠে, অন্যের ভালো খেলার গুণ দেখে, স্বীকৃতি দিতে শেখে, খেলার নিয়ম মেনে সে শৃঙ্খলা মানতে শেখে, দলনেতার নির্দেশ মানতে শেখে, দলের একজন হয়ে খেলতে জানে, মনে দলীয় বোধ জন্মায়। খেলার নিয়ম তাকে নিজের স্বাধীন ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায়। অনুকরণমূলক খেলায় শিশুর নানারকম মানুষের দায়িত্ব, কর্তব্য উপলব্ধি করে এবং নিজেও সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে শেখে।

সর্বোপরি প্রশংসা, উৎসাহের মতন মানুষের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার এমন সহজ উপায় আর নেই। এ শুধু যে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায় তা নয়, তার ভিতরের ত্রুটি, সীমবদ্ধতার দেয়াল ভেঙে এ দুটি উপায় তাকে অনেক অনেক উপরে নিয়ে যায়। একজন শিশু তার শারীরিক বা মানসিক সীমাবদ্ধতার অনেকখানিই প্রশংসা এবং উৎসাহ পেলে জয় করতে পারে। এর বিপরীতে তিরস্কার, ত্রুটি বা ভুল ধরার ফলে একজন মানুষ এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা তো হারিয়ে ফেলেই বরং সুস্থতা, মানসিক ভারসাম্য পর্যন্ত হারিয়ে ফেলতে পারে। সমালোচনার মধ্যে বেড়ে ওঠে শিশুও সমালোচক হয়ে বেড়ে ওঠে যে অন্যের ভালো দিকটি দেখতে পায় না বরং ত্রুটিই তার চোখে ধরা পরে। প্রশংসা করে একজন শিশুকে দিয়ে অত্যন্ত কঠিন কাজও সম্পন্ন করানো যায়। মারধর করলে শিশুর মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এমন অনেক শিশু আছে যারা স্কুলে শিক্ষকের কাছে মার খেয়ে স্কুলের প্রতি, শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে স্কুলই ত্যাগ করেছে চিরতরে। মারধরে শুধু যে শিশুর মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তা নয় বরং এর ফলে শিশুর আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা আঘাতপ্রাপ্ত হয়, শিশু অপমান বোধ করে এবং অন্যের সামনে সে অপদস্থ হয়ে আত্মমর্যাদা হারায় বলে সে যা ইচ্ছা তাই করার স্বাধীনতা গ্রহণ করে। তাছাড়া বাড়িতে যে শিশু বাবাকে দেখে তার মাকে, ছেলেমেয়েকে মারধর করতে, সে শিশু বাবাকে অনুকরণ করে বড় হয়ে একই কাজের পুনরাবৃত্তি করে। শিশু এমন বাবাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করে না বটে কিন্তু এসব দৈনন্দিন আচরণ তার মনে গভীর ছাপ ফেলে এবং সহজে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে এ অভ্যাসকে স্বাভাবিক উপায় বলে গ্রহণ করে।

অনেকগুলো ভালো মূল্যবোধও শিশুরা মা-বাবার কাছ থেকে শেখে। বিশেষ করে, মা-বাবার নৈতিকতা, নীতিবোধ, সত্যের প্রতি নিষ্ঠা, দরিদ্রের প্রতি সহমর্মিতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, উদারতা ইত্যাদি অতি সহজে সন্তানের মধ্যে গভীর প্রভাব ফেলে। এছাড়া কতগুলো দৈনন্দিন আচার-ব্যবহার যেমন

www.amarboi.org

পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস, কথা রাখা, সময়ানুবর্তিতা ইত্যাদি শিশু মা-বাবার কাছ থেকে শেখে।

শিশু পালনে মা-বাবার বিশাল, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য পরিবারকে শিশুর প্রথম বিদ্যালয় বলা হয়। পরিবারেই আসলে শিশু তার জীবনের সবরকম শিক্ষার সিংহভাগ আনুষ্ঠানিকভাবে শিখে নেয়, অর্জন করে। কাজকর্ম থেকে শুরু করে আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, অভ্যাস, রুচি সবকিছুই প্রথম শিশুরা মা-বাবার কাছ থেকে শেখে। এরপর স্কুলে শিক্ষকের কাছ থেকে শেখা শুরু হয়। শিশু বিশেষজ্ঞদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে, শিশুর মগজের ৮০% গঠনের কাজ শিশুর দুই বছর বয়সের ভেতরে সম্পন্ন হয়ে যায়। সুতরাং শিশুর মেধার সঠিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে অতি অল্প বয়স, জন্মের পর থেকেই তাকে তার মানসিক বিকাশের জন্য কথা বলা, ছড়া বলা, ইন্দ্রিয়ের দক্ষতা বৃদ্ধির অনুশীলনের উপযোগী খেলা ও পরিকল্পিত কাজ করানো প্রয়োজন। বয়স উপযোগী সমস্যা সমাধানমূলক খেলাধুলা দেওয়া দরকার যাতে শিশুর সঠিক সময়ে মেধার উপযুক্ত চর্চা যথেষ্ট পরিমাণে হয়। এ কারণে উন্নত বিশ্বে শিশুর প্রাক-শৈশব বিকাশমূলক কার্যক্রম ক্রমশ গুরুত্ব লাভ করছে এবং বিস্তারও লাভ করছে। এ কর্মসূচির অধীনে Parenting education বা মা-বাবা হবার শিক্ষা যেমন প্রয়োজনীয় হয়ে হয়ে উঠছে তেমনি শিশুর দিবা যত্ন বা শিশুকেন্দ্র ভিত্তিক শিশুর বিকাশমূলক শিক্ষা কার্যক্রম জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

আমাদের দেশে মা-বাবা ও ছোট শিশুর শিক্ষকদের জন্য এই শিক্ষা একটি পাইলট টেস্ট ছাড়া এখনো পরিকল্পিত হয়নি। প্রাথমিক পর্যায়ের বিশাল ঝরে পড়া ও ফেলের হার হ্রাস করতে হলে পরিকল্পিত মা-বাবার ও শিক্ষকের শিক্ষা এবং শিশুর বিকাশমূলক শিক্ষা কর্মসূচির পরিকল্পনা করা অত্যন্ত জরুরি এবং এ কর্মসূচির ফল প্রাথমিক শিক্ষার সফলতায় পরিমাণগত ও গুণগত উভয়ক্ষেত্রে যুগান্তকারী হতে পারে।

www.amarboi.org

বাংলাদেশে শিশুর শৈশবকালীন যত্ন, শিক্ষা ও বিকাশ

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি এবং শিশুদের বিকাশ—উপযোগী অভিজ্ঞতার গুণগত মানোন্নয়নে শিশুর শৈশবকালীন যত্ন, শিক্ষা ও বিকাশ কর্মসূচি ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। বাংলাদেশের মত একটি দেশে যেখানে প্রাথমিক স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষার্থী হচ্ছে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী এবং তারা স্কুলে আসে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গত ও সামাজিক প্রস্তুতি ছাড়া, এমন অবস্থায় নিরক্ষর দরিদ্রের সন্তানেরা দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব জ্ঞানে ও দক্ষতায় সমৃদ্ধ থাকা সত্ত্বেও স্কুলের লেখাপড়ায় শিক্ষিত বাবা মায়ের সন্তানদের সাথে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে। দেখা যায় তারাও তাদের বাবা মায়েদের জীবনমানে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। যে দুষ্টচক্রে তাদের জীবন ও বংশধরদের জীবন বাঁধা পড়েছে তা ফিগার-১ চক্রটি দেখে ধারণা করা যেতে পারে।

ফিগার - ১	দরিদ্র ও নিরক্ষরের সন্তানদের সবলতা ও দুর্বলতা কিভাবে তাদের প্রতি নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে।
নিরক্ষর বাবা মায়ের সন্তান ও তাদের নিঃস্ব গৃহ-পরিবেশ	
সবলতা	**দুর্বলতা**
• বাধাহীন চলাফেরা পরিবেশ আবিষ্কারে সহায়তা করে • পরিবেশ সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান : গাছ, চারাগাছ, পশু, পাখি, প্রতিবেশী ইত্যাদি • গার্হস্থ্য কাজের কুশলতা • স্বাধীন, আত্মনির্ভর, শিশু পরিচর্যার এবং • ইচ্ছামত খেলা, দৌড়াদৌড়ি ইত্যাদি	• সীমিত শব্দভাণ্ডার • সঙ্গে সম্পৃক্ত উপকরণের অভাব • স্কুল শিক্ষার প্রতি প্রেরণাহীনতা • কর্ম ও আয়মূলক কাজের প্রতি আগ্রহ • বাবা-মা'র কাছ থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে কোন সাহায্য না পাওয়া • যত্ন ও মনোযেগের অভাব • পুষ্টির অভাব ও কম আয়োডিনযুক্ত খাদ্য

দেখা যাচ্ছে দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার কারণে দরিদ্রের সন্তানেরা লেখাপড়ার উপকরণ, সাহায্য, উৎসাহ তো লাভ করেই না বরং গৃহকর্ম, ছোট

www.amarboi.org

ভাইবোনদের পরিচর্যা, আয়মূলক কাজে যোগ দেওয়ার চাপের ফলে তারা পড়াশুনা করতে আরও বাধাগ্রস্ত হয়। এমনকি তাদের পরিবেশ সম্পর্কিত বাস্তব জ্ঞান, স্বাধীন মনোভাব, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, দায়িত্বশীলতা স্কুলের শিক্ষাক্রমে বিশেষ কোনো সহায়তা যোগায় না। তাছাড়া, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তারা নিত্যই রোগে ভোগে, পরিবেশ দূষণের বিষয়ে বাবা-মা'র অজ্ঞতাও তাদের রোগাক্রান্ত করে। যার ফলে স্কুলে তারা প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে এবং অনুপস্থিত শিশু তার শ্রেণির নিয়মিত পাঠ আয়ত্ত করতে অক্ষম থাকে। ফলে, অনেক কঠিন পাঠ তাদের অনায়ত্ত থেকে যায় এবং ক্রমশ তারা স্কুলের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, স্কুল থেকে হয় ঝরে পড়ে নতুবা নিম্ন মানের শিক্ষা নিয়ে কোনোরকমে পাস করে।

এরকম শিক্ষা ভালো আয়ের চাকুরি যেমন দিতে পারে না, তেমনি তা মাধ্যমিক স্কুলের বিষয়গুলো ভালোভাবে আয়ত্ত করতে সহায়ক হয় না বলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণ এদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। এরা বড় হয়ে স্বল্প আয়ের জীবিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, যে আয় দিয়ে তারা তাদের ছেলেমেয়েদের পুষ্টিকর খাবার, ভালো মানের লেখাপড়া, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সুবিধা কিনে দিতে পারে না। এই সন্তানরাও তাই তাদের বাবা মা'র জীবনের দুষ্ট চক্রে আবদ্ধ হয়ে থাকে।

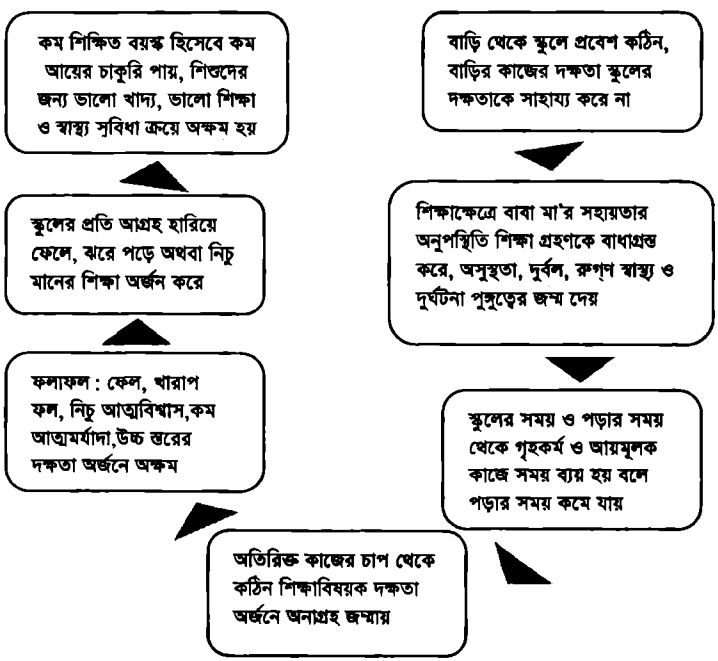

www.amarboi.org

অপরদিকে দেখুন শিক্ষিত পরিবারের সন্তানেরা তাদের সবলতা ও দুর্বলতা নিয়ে তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়। শুভ চক্রটি লক্ষ্য করুন।

ফিগার - ২	সাক্ষর পিতামাতার সন্তানদের সবলতা ও দুর্বলতা কিভাবে তাদের জীবনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

শিক্ষিত বাবা মায়ের সন্তান ও তাদের সচ্ছল গৃহ-পরিবেশ	
সবলতা	**দুর্বলতা**
• ছড়া, গল্প, সংগীত শোনে	• সীমাবদ্ধ নড়াচড়া সক্রিয়তাকে সীমাবদ্ধ করে রাখে
• সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডার, ছবি দেখে, টিভি দেখে, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন দেখে	• পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কহীন জীবনযাপন করে
• সমস্যার সমাধানযুক্ত খেলা, খেলনা, কম্পিউটার ব্যবহার করে	• অতিরিক্ত মনোযোগ তাদেরকে অপরের ওপর নির্ভরশীল করে, তারা কাজ অপছন্দ করে
• বাবা-মা উৎসাহ, প্রশংসা, মনোযোগ দেয়	• খেলাধুলা সীমাবদ্ধ, অনুমোদিত
• আমিষযুক্ত খাদ্য, আয়োডিনযুক্ত লবণ ও মাছ পর্যাপ্ত পায়	• ঘরের কাজে কোনরকম দায়িত্ব নেই
• রোগের টীকা ও দ্রুত চিকিৎসা সুবিধা লাভ করে	• বইকে শিখনের একমাত্র উৎস মনে করে

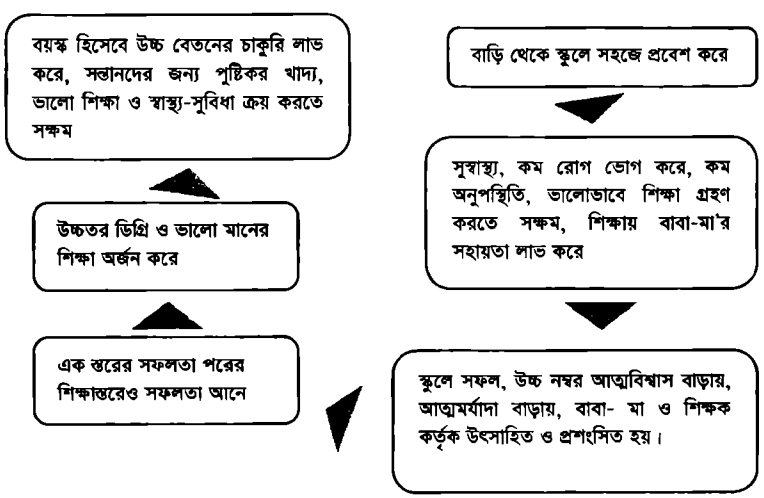

এই চক্রে দেখা যায় একদিকে এসব শিশুরা শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বপ্রস্তুতি বাড়িতে লাভ করে এবং সে কারণে সহজে স্কুলে প্রবেশে সক্ষম হয়।

www.amarboi.org

এমনকি এদের দুর্বলতাগুলোর সঙ্গে যেহেতু শিক্ষাক্রমের কোনো সম্বন্ধ নেই সেজন্য এগুলো তাদেরকে শিক্ষা গ্রহণে কোনো বাধা দান করে না। অপরদিকে তারা ভালো খাদ্য ও দ্রুত টীকা ও চিকিৎসা পেয়ে নীরোগ থাকে। ফলে, স্কুলে অনুপস্থিত কম থাকে এবং লেখাপড়ায় কোনো পাঠে পিছিয়ে পড়ে না। তাদের সামনে অনায়ত্ত পাঠের বোঝা জমা হয় না, শিক্ষিত বাবা-মা পাঠে সহায়তা করে। ফলে, তারা সহজে স্কুলে ভালো ফল করে। যার ফলে তারা বাবা-মা ও শিক্ষকের কাছে প্রশংসা লাভ করে। এক স্তরের সফলতা শিক্ষার পরের স্তর গুলোতেও সফলতা আনে, সুতরাং বয়স্ক হিসেবে ভালো মানের ডিগ্রি ও শিক্ষার দ্বারা ভালো আয়ের চাকুরি লাভ করে। এই ভালো আয় দ্বারা তারা সন্তানদের জন্য ভালো খাদ্য, ভালো শিক্ষা, ভালো স্বাস্থ্য সুবিধা কিনতে সক্ষম হয় বলে তাদের সন্তানেরাও ভালো মানের জীবনযাপন করে। এটিকে শুভ চক্র বলা যেতে পারে।

এখন বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের সিংহ ভাগ শিক্ষার্থী নিরক্ষর দরিদ্রের সন্তানদের মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে সহায়তা করে এমন কোনো পন্থা উদ্ভাবন অথবা অনুসরণ প্রয়োজন। এমনই একটি পন্থা শিশুর শৈশবকালীন যত্ন, শিক্ষা ও বিকাশ কর্মসূচি যা সব শিশুদের স্কুলের জন্য উপযুক্ত পূর্ব-প্রস্তুতিমূলক দক্ষতা প্রদান করে এবং অপরদিকে তাদের সঠিক বিকাশ - দৈহিক, সামাজিক, আবেগিক, ভাষাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশকে নিশ্চিত করে, যার ফলে শিশুরা স্কুলের প্রথম শ্রেণি থেকে ওপরের শ্রেণিগুলোর শিক্ষা সফলতার সঙ্গে অর্জন করতে সক্ষম হয়।

শিশুর বিকাশ, শিশুর যত্ন ও শিশুর শিক্ষা

শিশুর বিকাশ বলতে প্রধানত,তার দৈহিক বিকাশ বিশেষত নড়াচড়ার ক্ষমতা ও বিভিন্ন অঙ্গের কাজের সমন্বয় করার দক্ষতা, বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা বিশেষত চিন্তা করার ও যুক্তি বোঝার ক্ষমতা, আবেগিক বিকাশ বিশেষত বিভিন্ন অনুভূতি প্রকাশের দক্ষতা, সামাজিক বিকাশ যা নিজেকে অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করার দক্ষতা বোঝায়। আসলে একটি শিশু একই সঙ্গে দৈহিক ক্ষেত্রে, বুদ্ধিতে, আবেগে, সামাজিকতায় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গরূপে বেড়ে ওঠে। এ কারণে শিশুর বিকাশকে শিশুর দ্বারা ক্রমশ বিভিন্ন রকম আচরণ অর্জনকে বোঝায়, যা সহজ থেকে ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠে। এটি ঘটে শিশু ও তার পরিবেশের বস্তু, প্রাণী ও মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। প্রতি শিশুই বিকাশের ক্ষেত্রে ভিন্ন, কেউ কারো মত নয়।

www.amarboi.org

শিশুর যত্ন বলতে সাধারণত বোঝায় —পুষ্টিকর খাদ্য, প্রয়োজনীয় টীকাসহ স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা, স্নেহ-ভালবাসা, প্রতিক্রিয়া করা, উদ্দীপনা সৃষ্টি, নিরাপত্তা প্রদান এবং খেলাধুলার মাধ্যমে আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে আগ্রহী করে তোলা। এসবই বড়দের কাছ থেকে, বাবা-মা'র কাছ থেকে শিশুর প্রাপ্য অধিকার।

শৈশবকালীন শিক্ষা

শিশুর শৈশবকালীন বা ৩—৫ বছর বয়সের প্রাক—শিক্ষা ও স্কুলের প্রস্তুতিজনিত কর্মসূচিকে শৈশবকালীন শিক্ষা বলে। এ স্তরে প্রাক—পড়া, প্রাক—লিখা, প্রাক—গণনা ও সামাজিক, দৈহিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, ভাষাগত, আবেগিক ও নৈতিক বিকাশের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। একটি গবেষণার মাধ্যমে বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত প্রাক - শৈশব বা শৈশবকালীন শিক্ষার রূপ ও বৈশিষ্ট্য কি ধরনের তা দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। এই গবেষণায় ৫০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২৪টি প্রাইভেট প্রাইমারি স্কুল যেখানে শিশু শ্রেণি আছে, ৬টি বাংলা মিডিয়াম মাধ্যমিক স্কুল, ৫টি ইংরেজি মাধ্যম মাধ্যমিক ও কিন্ডারগার্টেন, ৭টি মক্তব/মাদ্‌রাসা, ৭টি সরকারি শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র, ২টি এনজিও শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র, ৫টি সরকারি এতিমখানা, ৯টি প্রাইভেট এতিমখানা বা শিশু সদন, ৫টি পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পাড়া সেন্টারসহ সর্বমোট ১২০টি প্রতিষ্ঠানে একটি জরিপ পরিচালিত হয়।
এই নমুনা জরিপ থেকে নিম্নোক্ত ফল পাওয়া গেছে

- সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণি পাওয়া গেছে,- যাকে স্থানীয়ভাবে 'ছোট ওয়ান' বলে যেখানে ৪ - ৫/৬ বছরের শিশুরা ভর্তি হয়েছে
- গড়ে প্রতিটি প্রাক- প্রাথমিক শিশু শ্রেণিতে ৪৮ জন শিশু আছে এবং শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত ১ :২০ - ১ :৫০
- স্কুল সময় দৈনিক ২— ৩ ঘন্টা
- ছাত্র বেতন মাসিক ২০০ টাকা থেকে ১০০০/- টাকা (সরকারি স্কুল বাদে)
- শিক্ষক বেতন মাসিক ৫০০/- টাকা থেকে ১০,০০০/- টাকা পর্যন্ত। গড় শিক্ষকের (৪৫ জনের) বেতন ৩,০০০/— ৩,৫০০/- টাকা

www.amarboi.org

- শিক্ষকের সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা এম.এ. এবং সর্বনিম্ন মাধ্যমিক পাস; অধিকাংশ শিক্ষক বি.এ. (৭১ জন), ৫৬ জন এস.এস.সি. এবং ৫৪ জন এইচ.এস.সি ডিগ্রিধারী
- ৫৪ জন শিক্ষকের পিটিআই প্রশিক্ষণ আছে
- ২৮% শিশু শ্রেণিতে শিক্ষা উপকরণ আছে যেমন, চার্ট, ছবি ও কিছু খেলনা আছে।
- শিক্ষক বা শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রের যত্নকারীর দৃষ্টিতে শিশুদের মৌলিক প্রয়োজন ও যত্ন অর্থ পুষ্টিকর খাদ্য বিশেষত দৈহিক বিকাশের জন্য। একই মত বাবা—মা ও শিশু বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকেও পাওয়া গেছে।
- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণির জন্য কোনো ব্যয় নেই, বেতনও নেই।
- শিক্ষক, শিশু যত্নকারী এবং বাবা-মা সবাই মারধর করার মন্দ প্রভাব সম্পর্কে খুবই সচেতন। তাছাড়া তারা মনে করে গৃহে মায়ের ওপর সহিংসতা, স্কুলে শিক্ষকের কর্কশ ব্যবহার শিশুদের সার্বিক বিকাশের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলে।
- অধিকাংশ স্কুল ও দিবাযত্ন কেন্দ্রে বা এতিমখানার শিক্ষাক্রম প্রায় একইরকম : বর্ণ শিক্ষা, সংখ্যা, আঁকা, ছড়া, সংগীত, পড়া ও লিখার কাজই প্রধান। মক্তব, মাদ্‌রাসায় আরবি পড়তে শেখাই প্রধান শিখন কার্যক্রম। এই কার্যক্রম বাবা মায়ের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অর্থাৎ স্কুল থেকে তারা যা পেতে আশা করেন, তার সঙ্গে মিল রয়েছে কেননা তারা স্কুল থেকে বাংলা, ইংরেজি পড়া, লিখা ও অংক শেখা চেয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের যত্নপূর্ণ স্নেহ আচরণও চেয়েছেন।
- শৃংখলা রক্ষার পন্থা হিসেবে ৯০% শিক্ষক বলেছেন তাঁরা এটি করেন - শিশুদের যত্নের সঙ্গে বুঝিয়ে বলে, তিন ভাগের এক ভাগ শিক্ষক বলেছেন তাঁরা শিশুদের বকুনি বা গালমন্দ দিয়েও শৃংখলা রক্ষা করেন।

  সবাই স্বীকার করেছেন যে, বুদ্ধির বিকাশ ঘটানো সম্ভব এবং তাঁরা এটিকে পুষ্টিকর খাদ্য, খেলাধুলা, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, সমস্যামূলক ধাঁধা দিয়ে ও গল্প বলে করা যায় বলে উল্লেখ করেন।

www.amarboi.org

- শিশু বিশেষজ্ঞেরা শিশুদের বিকাশের নির্দিষ্ট মাইলফলক (Milestone) ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভিন্নতার পরিচয় দিয়েছেন যা নানারকমের প্রতিবন্ধিতার বিপদ হ্রাসের বিষয়ে গৃহীত কর্মতৎপরতার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।
- শিশু বিশেষজ্ঞরা প্রাক—বিদ্যালয় শিক্ষার শিখন প্রয়োজন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন - বর্ণ ও সংখ্যা শেখাকে যা বাবা—মা'র মতের সঙ্গে মেলে। কয়েকজন শিশুদের বিকাশের প্রয়োজনে গল্প বলা, আঁকা, পেন্টিং এবং সমস্যার সমাধানমূলক খেলার উল্লেখ করেছেন।

সুপারিশমালা এই জরিপ থেকে প্রাপ্ত ফলের ভিত্তিতে কিছু সুপারিশ তৈরি করা হয়েছে। প্রথমত নিচের টেবিল থেকে দেশে কত ধরনের শিশু শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে তা উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করা যেতে পারে :

টেবিল -১	শিশুশিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ								
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
সরকারি বেসরকারি প্রাইমারি স্কুলের এবং শিশু প্রক্যাডেমীর শিশু শ্রেণী	সরকারি, এনজিও এবং প্রাইভেট শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র	প্রতিবন্ধী দের স্কুল	উপজাতি সংখ্যালঘুদের স্কুল	মসজিদ-ভিত্তিক মক্তব ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসা	বাংলা, ইংরেজি, মাধ্যমের প্রাইভেট স্কুলের শিশু শ্রেণী/কিন্ডা রগার্টেন	এতিমখানা বা শিশু পল্লী	স্যাটেলাইট স্কুল	'হার্ড টু রিচ' প্রজেক্ট	কর্মক্ষেত্র, অফিসে, ফ্যাক্টরীতে দিবাযত্ন কেন্দ্র

প্রস্তাবিত কর্মসূচি প্রণয়ন কৌশল

- ৩ - ৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য শৈশবকালীন যত্ন, শিক্ষা ও বিকাশ কর্মসূচি পর্যায়ক্রমে প্রণয়ন করা যেতে পারে। দেশের আনুমানিক ৯ মিলিয়ন শিশু এ বয়সের অন্তর্গত, যাদেরকে ২০১৫ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এই বিপুল, বিশাল কাজ সরকারের একার পক্ষে বাস্তবায়ন করা সুকঠিন বলে এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন ধরনের শিশুশিক্ষা সেবা প্রদানকারী বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের একযোগে কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে।

www.amarboi.org

- সরকারের এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রয়েছে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি যোগ করে এটি করা সম্ভব। জাতীয়ভাবে বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিশুশিক্ষার একটি বিকল্প ধারা তৈরি সম্ভবপরও নয়, কাঙ্ক্ষিতও নয়।
- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান প্র্যাকটিস অনুসরণে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি এক বছরের অথবা ছয় মাসের শিশু শ্রেণির শিক্ষার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব যা ২০০০ সালের শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছিল। অথবা ফিলিপাইনের মত প্রথম শ্রেণির প্রথম আট সপ্তাহ সময়কে পূর্ব প্রস্তুতিমূলক শিক্ষার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
- সরকারি, প্রাইভেট, এনজিওদের দ্বারা পরিচালিত শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রে ৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য কেন্দ্রভিত্তিক শৈশব যত্ন শিক্ষা ও বিকাশ কর্মসূচি গৃহীত হতে পারে।
- এলাকা বা পাড়াভিত্তিক শৈশব যত্ন, শিক্ষা ও বিকাশ কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে যেখানে আগ্রহী মহিলারা তাদের বাড়িতে কয়েকজন শিশুর যত্ন ও শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋণ দলের সদস্য, স্থানীয় সরকারের সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য বাড়ি-ভিত্তিক শিশু যত্ন কেন্দ্র খুলতে পারে যা স্থানীয় সরকার তত্ত্বাবধান করতে পারে।
- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে শিশু শ্রেণির বাস্তবায়ন একটি অনুকরণীয় এবং স্থানীয় উদ্যোগের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই শ্রেণিকে শৈশবকালীন যত্ন, শিক্ষা ও বিকাশ কর্মসূচিতে রূপান্তরিত করাই হবে উপযুক্ত কাজ।
- যেসব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এলাকায় বেসরকারি সংস্থা, এনজিও রা বিভিন্ন শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে সেসব এলাকায় শৈশব শিক্ষা ও বিকাশ কর্মসূচির দায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত করা যায়।
- শিশু ও মহিলা মন্ত্রণালয়ের অধীনে শিশু একাডেমির দ্বারা পরিচালিত শিশু শ্রেণিতে শৈশবকালীন যত্ন, শিক্ষা ও বিকাশ কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করে এ কর্মসূচিকে আরও শিশু-বান্ধব করা যায়।
- বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী এবং উপজাতি শিশুদের শিশুর চিরন্তন বিকাশজনিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। একইভাবে মাদ্‌রাসা ও মক্তবের একঘেঁয়ে আনন্দহীন, দৈহিক শাস্তির ভীতিপূর্ণ

www.amarboi.org

শ্রেণিগুলোকে ঐ শিশুদের জন্য এ কর্মসূচির সাহায্যে আনন্দের, শিশু-বান্ধব এবং শিশু বিকাশমূলক শিক্ষায় পরিণত করা প্রয়োজন।

- বাবা-মায়েদের জন্য সরকারের এবং এনজিও দের বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি, ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি, স্বাস্থ্যসেবা, টীকা দিবসে এবং মা-বাবাদের সবরকম কর্মস্থলে, সবরকম পেশাগত সংগঠনের কাজকর্মে এই শিশু যত্ন, শিক্ষা ও বিকাশ-এর মূল বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, যার ফলে বাবা-মা'র যত্ন নেবার জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।
- বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সমাজ ও এনজিও দের এই কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা হলে সরকারের অর্থনৈতিক চাপ কমবে।

শৈশবকালীন যত্ন, শিক্ষা ও বিকাশ কর্মসূচি প্যাকেজ

- এই কর্মসূচিতে ৩ - ৫ বছর বয়সী শিশুদের বিকাশমূলক প্রয়োজন (দৈহিক, সামাজিক, আবেগিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক) এবং শিখন প্রয়োজন (প্রাক-পঠন, প্রাক-লিখন, প্রাক-গাণিতিক দক্ষতা ও প্রাক-ভাষা দক্ষতা - শোনা, বলা), সামাজিক দক্ষতা যেমন জোড়ায়, দলে একসঙ্গে কাজ করতে পারা, চিন্তার দক্ষতা —ছোট ছোট সমস্যার সমাধান, যুক্তির দক্ষতা, অনুভূতি এবং বোধ, সৃজনশীলতা এবং আবিষ্কার, পরিকল্পিত খেলা এবং বাধাবন্ধনহীন খেলা, নিজের কাজের দায়িত্ব গ্রহণ ইত্যাদি পূরণ করার ব্যবস্থা থাকবে।

শিক্ষক ও যত্নকারীদের প্রস্তুতি

- এই কর্মসূচির সফলতা নির্ভর করে যথোপযুক্ত শিক্ষক ও শিশু যত্নকারীর প্রশিক্ষণ-এর ওপর। এটিও শৈশবকালীন যত্ন, শিক্ষা ও বিকাশ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে পূরণ করে প্রণীত হতে হবে, যার ফলে শিশুরা গুণগত মানসম্পন্ন যত্ন ও শিক্ষা লাভ করে।
- নেপ ও পিটিআই—এর প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতেও এই শৈশব যত্ন, শিক্ষা ও বিকাশ—এর বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার—যাতে এই ক্ষেত্রে দেশে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক তৈরি হতে পারে।
- সরকারি বিদ্যালয়সহ যেসব প্রতিষ্ঠান এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে তাদেরকে যেসব এনজিও এক্ষেত্রে অভিজ্ঞ, তারা সহায়তা প্রদান করতে পারে।

www.amarboi.org

মান নিয়ন্ত্রণ

- বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সুবিধাগুলো যেমন খেলার মাঠ বা খোলা জায়গা রাখা, খেলার জন্য একটি পিরিয়ড রাখা যা শিশুদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশকে সহায়তা করে।
- নেপ একটি প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করতে পারে। এ লক্ষ্যে মূল্যায়ন, ছোট ছোট শ্রেণিকক্ষভিত্তিক গবেষণা করতে পারে যা শিক্ষক, শিশু যত্নকারী এবং শিশু শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেবে।

পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শন

- পিএমইডি, ডিপিই ও এনসিটিবি'র কর্মকর্তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ কর্ম-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা দরকার। এ লক্ষ্যে তিন মাসে কমপক্ষে একবার যুগ্ম পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।
- সরকারি, বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানকারী সব প্রতিষ্ঠানের সব স্তরের পরিদর্শকদের শৈশবকালীন যত্ন, শিক্ষা ও বিকাশ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা দরকার যাতে তারা তাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব আরও দক্ষতার সঙ্গে পালন করতে সক্ষম হয়। প্রতি থানার এটিইও'র ওপর এই কর্মসূচি তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের দায়িত্ব থাকবে।
- একটি সহজ কিন্তু কার্যকর পরিদর্শন চেকলিস্ট প্রণয়ন করা দরকার যাতে শিশুদের নিরাময়মূলক পাঠদান পরিকল্পনা করা সহজ হবে।

ইসিসিইডি সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন

- ডাকার কনফারেন্সের 'ইফা' আহ্বানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সরকারের একটি নীতি প্রণয়ন করা দরকার যাতে এই কর্মসূচিটি শীঘ্রই শুরু করা সম্ভব হয়।

সম্পদ সমাবেশীকরণ

- বাংলাদেশের মত স্বল্প সম্পদের দেশে ৯ মিলিয়ন ৩—৫ বছর বয়সী শিশুর জন্য শৈশবকালীন যত্ন, শিক্ষা ও বিকাশ কর্মসূচির অর্থায়ন খুবই কষ্টসাধ্য হবে। সেজন্য এ লক্ষ্যে দাতা সংস্থা, এনজিও, বেসরকারি সেক্টর, সুধীসমাজ এবং জনসমাজকে সম্পদ ও জনশক্তি নিয়ে এক্ষেত্রে

www.amarboi.org

অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো দরকার। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় সরকারের সাহায্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন কৌশল কর্মসূচিকে সহজসাধ্য করবে।

- ব্র্যাকের প্রাক—প্রাথমিক কর্মসূচির অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীও সন্তানদের শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করে যখন তারা দেখে যেসব শিক্ষা ভালো, শিশুদের জন্য উপকারী এবং মূল্যবান। এই উদাহরণ অন্য শৈশব শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

সামাজিক সমাবেশিকরণ ও অধিপরামর্শ

- যেহেতু ই সি সি ই ডি একটি নতুন ধারণা সেহেতু শিশুদের জীবনের প্রধান পরিকল্পকবৃন্দ অর্থাৎ নীতি নির্ধারক, পিতামাতা, শিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ, এনজিও কর্মকর্তা, আইন প্রণেতা, স্থানীয় সরকার কর্মকর্তা, তথ্য-মাধ্যম কর্মকর্তা সবাইকে কার্যকরভাবে এ বিষয়ে অবহিত করা প্রয়োজন। কেননা দরিদ্র শিশু তার ভঙ্গুর পরিস্থিতির শিকার এবং অসুবিধাগ্রস্ত শিশু, বালিকা, দরিদ্র শিশু, সংখ্যালঘু ও উপজাতি শিশু এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের কার্যকর সেবা পৌছানো 'এডুকেশন ফর অল' (ইফা) - এর প্রধান লক্ষ্য।
- এনসিটিবি, ডিপিই ও তথ্য মাধ্যমের ব্যক্তিত্বদের সহায়তায় একযোগে এ বিষয়ে প্রচারপত্র যেমন লিফলেট ও পোস্টার মুদ্রণ করে, টিভি, বেতার স্কিট এবং শর্ট ফিল্ম তৈরি করে সারা দেশে প্রচার করতে পারে।
- পিএমইডি, ডিপিই কর্মকর্তা, সাংসদ ও সমাজ নেতাদের জন্য অবহিতকরণ সভার আয়োজন করতে হবে।
- কর্মসূচিকে শক্ত ভিত্তি প্রদান করার লক্ষ্যে এ বিষয়ে গবেষণা করা একান্ত প্রয়োজন। এ কর্মসূচির উপকারিতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভের জন্য পরিষ্কার ও শক্ত প্রমাণ বের করতে এসব গবেষণা সহায়ক হবে।

নিচে দেখুন কিভাবে শৈশবকালীন যত্ন, শিক্ষা ও বিকাশ কার্যক্রম ধাপে ধাপে শিশুর শিখনের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে :

www.amarboi.org

ফিগার - ২

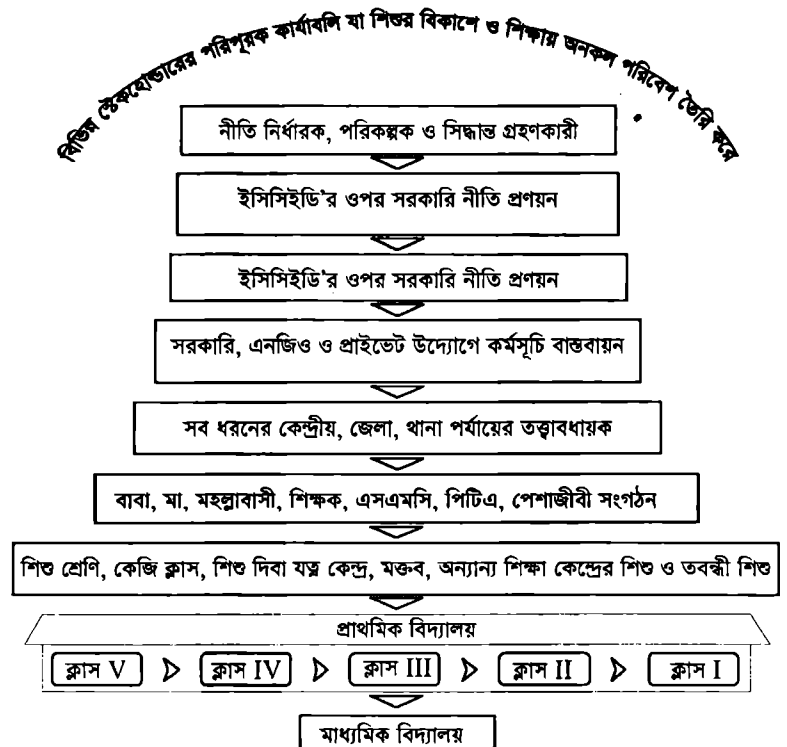

উপসংহার :

পৃথিবীর বহু কাজ অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু শিশুর প্রয়োজন অপেক্ষা করতে পারে না, তাদের প্রয়োজনগুলো ফেলে রাখা যায় না। কারণ তার অধিকাংশ বিকাশ ০-৭/৮ বছরের মধ্যে সমাপ্ত হয়ে যায় এবং তার বিকাশের, শিক্ষার সব পরিকল্পনা তৈরি হয় বয়স্কের ইচ্ছায় এবং বয়স্কের দ্বারা। সেজন্য শিশুর বিকাশ পুরোপুরি বয়স্কের অর্থাৎ বাবা-মা, আত্মীয়, শিক্ষক, প্রতিবেশী, চিকিৎসক-নার্স, শিক্ষাবিদ, নীতি-নির্ধারক, তত্ত্বাবধায়ক, কর্মসূচি বাস্তবায়নকারীর যত্নের রীতি, শিক্ষা, জ্ঞান, প্রশিক্ষণ, পছন্দ ও অভ্যাসের ওপর নির্ভরশীল।

সুতরাং এক কথায় বলা যায়, বাংলাদেশের শিশুরা বয়স্কদের সময়োপযোগী পদক্ষেপের জন্য অপেক্ষা করছে, কেননা ভালো শৈশবকালীন যত্ন, বিকাশমূলক কাজ ও শিক্ষা কর্মসূচি ভালোমানের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ। ভালো মানের শিশুর যত্ন ও প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা পরবর্তীকালে তাদের ভালো মানের শিক্ষা অর্জনে সফল করে।

www.amarboi.org

মানসম্মত শিক্ষা ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষার সুফল বা অবদান মানুষের জীবনে কতটা, তা পরিমাপ করা এক কথায় কঠিন। শিক্ষা এমন একটি অধরা বস্তু যা তৌলদণ্ডে পরিমাপ করা যায় না, যার ফল পরিমাপ করে বলা যায় না যে এত টাকা ব্যয় করে যে শিক্ষা গ্রহণ করলাম তার ফল এত টাকার চাকরি। চোখের সামনেই রয়েছে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকার। শিক্ষার ফল যা হতে পারে তার অনেকটাই তারা নস্যাৎ করে দেয়।

তাহলে কি শিক্ষার ফল পুরোপরি ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাবে? না। তাও সঠিক নয়। শিক্ষার ফল দেখতে চাইলে দেখতে হবে শিক্ষিতের জীবনাচরণে শিক্ষা কী কী ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা ঘটিয়েছে। শিক্ষা পরিবর্তনের অনুঘটক। ব্যক্তির জ্ঞানে, আচরণে, দৃষ্টিভঙ্গিতে, সমস্যা সমাধানের দক্ষতায়, কোনো কাজ করার দক্ষতায় শিক্ষা যে পরিবর্তন আনে তার ফলে ব্যক্তি এসব ক্ষেত্রে একটি গুণগত মান অর্জন করে যা তাকে জীবিকায়, জীবনযাপনে সফলতা অর্জনে সহায়তা করে। এই ঘটনাগুলো বাস্তবে দৃশ্যমান হয় যদি একজন শিক্ষিত এবং একজন নিরক্ষরের জীবনের নানা আচরণ, অভ্যাস, তাদের নিজ জীবনের সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, তাদের পেশার কাজে গুণগত মানের পার্থক্য পর্যবেক্ষণ করা যায়।

দেখা যায়, একজন নিরক্ষর মানুষ সস্তায় যে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারেন তাই গ্রহণ করেন, কিন্তু একজন শিক্ষিত ব্যক্তি সস্তাতেই খাদ্য সংগ্রহ বা বাছাই করতে তার জ্ঞানকে কাজে লাগান অর্থাৎ সস্তায় কত উন্নতমানের এবং নানারকম পুষ্টিকর খাদ্য কেনা যায়, সেরকম একটি মানসিক পরিকল্পনা তাকে পরিচালিত করে। এমনকি তিনি একটু বেশি পয়সা খরচ করে দু'একটি উন্নতমানের খাদ্য কিনতে আগ্রহী হন। খাদ্যের গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য শিক্ষিতের ক্রমশ অর্জিত আধুনিক জ্ঞান তাকে নির্দেশ দেয়, আগ্রহী করে তোলে এ আমরা নিজেদের জীবনেই দেখতে পাচ্ছি যা নিরক্ষরের মধ্যে অনুপস্থিত।

আজকে দৈনিক খাদ্য তালিকায় অন্তত পক্ষে একটি মৌসুমী ফল থাকা দরকার, তা আমরা রাখতে সচেষ্ট হই। এভাবে শিক্ষিতের দৈনন্দিন খাদ্য

www.amarboi.org

তালিকায় আমড়া থেকে শুরু করে ডেউয়া, বেতফল, জামরুল, আমলকি পর্যন্ত স্থান লাভ করেছে। এছাড়া, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্য আয়োডিনযুক্ত লবণ ও সামুদ্রিক মাছ খাবার প্রতি শিক্ষিতের নতুন আগ্রহ নিরক্ষরের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না।

ছোট শিশুরা যেসব দুর্ঘটনায় পড়ে শৈশবের নানারকম প্রতিবন্ধিতায় মৃত্যুর আশঙ্কার সম্মুখীন হয়, সেসব ঘটনা নিরক্ষর মায়েদের মধ্যে যত বেশি, শিক্ষিত মায়েদের মধ্যে তত নয়। কুপি, মোমের আগুন হাতের কাছে রাখা, ওষুধ ভেবে বিষ খাওয়া, পড়ে গিয়ে হাতপা ভাঙা, শিশুতে শিশুতে খেলতে গিয়ে চোখে খোঁচা লাগা, নাকে, কানে বিচি, পয়সা ঢুকিয়ে ফেলা, পুকুরে পড়ে ডোবা এসব দুর্ঘটনা থেকে শিশুকে রক্ষা করার জন্য একজন শিক্ষিত মা যত বেশি সতর্ক থাকেন, একজন নিরক্ষর মা ততটা সতর্ক থাকেন না। এর কারণ, একজন শিক্ষিত মা এসব দুর্ঘটনার ফলাফল উপলব্ধি, আন্দাজ করতে পারেন বলেই এতটা সতর্ক থাকেন যা নিরক্ষর মায়ের ধারণার বাইরে থাকে।

একজন শিক্ষিত ব্যক্তি রোগের চিকিৎসার জন্য যত দ্রুত ডাক্তারের সাহায্য গ্রহণ করেন, একজন নিরক্ষর রোগের জটিলতা বুঝতে অক্ষম হওয়ায় সময় ক্ষেপণ করেন, ডাক্তারের কাছে না গিয়ে ঝাড়ফুঁক, পানিপড়া, তাবিজ ইত্যাদিতে নির্ভর করে থাকে যার ফলাফল প্রায়ই তাদের বিপক্ষেই যায়।

একজন শিক্ষিত মানুষ দৈহিক পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন, পায়খানায় মল ত্যাগের প্রয়োজন, বিশুদ্ধ পানি পানের ও ব্যবহারের প্রয়োজন, গর্ভবতী মায়ের উন্নত ও বেশি খাদ্যের প্রয়োজন, শিক্ষিত ডাক্তার বা দাই-এর দ্বারা প্রসব করানোর প্রয়োজন সম্পর্কে যে পরিষ্কার ধারণা লাভ করেন এবং সে ধারণার ভিত্তিতে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা একজন নিরক্ষরের কাছ থেকে আশা করা যায় না।

এছাড়াও, দেখা যায়, একজন নিরক্ষর মানুষ গ্রাম থেকে শহরে এসে যত সহজে শঠ ও প্রতারকের ফাঁদে পড়ে সর্বস্ব খোয়ায়, তাদের সংখ্যা শিক্ষিতের চেয়ে অনেক বেশি, কেননা শিক্ষিত ব্যক্তি সংবাদপত্র ইত্যাদি থেকে নানা ধরনের শঠতার কৌশল সম্বন্ধে পূর্ব ধারণা লাভ করে নিজেকে সেভাবে প্রস্তুত করে নেয়।

কিছু কিছু উন্নততর জীবনযাপন প্রণালী মূলত শিক্ষানির্ভর। যেমন, ছোট পরিবার জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান করে, পরিবারের খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি খাতে ব্যয় অনেক কম রাখে এ সুফল একজন শিক্ষিতের পক্ষে মূল্যায়ন করে ব্যবস্থা গ্রহণ যত সহজসাধ্য একজন নিরক্ষর যে জীবের জন্মকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়, তার পক্ষে মোটেও সহজ নয়।

www.amarboi.org

তদুপরি, পরিবার পরিকল্পনার কৌশল বা পদ্ধতিগুলো যে ধরনের তা একজন শিক্ষিত যত সহজে ব্যবহার করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, একজন নিরক্ষর ততটা নয়। কারণ কিছু পড়ে কিছু জানা, কোনো তথ্য মনে রাখা, তারিখ ও ঘন্টা বেঁধে ওষুধ খাওয়া ইত্যাদিতে সে অভ্যস্ত নয়। ওষুধ খাওয়ার সময় দেখা যায়, কোনটা কখন খাবে, কোনটা খাওয়ার আগে, কোনটা পরে, কোনটা ৬ ঘন্টা পর ইত্যাদি মেনে চলার জন্য সাক্ষরতা কত প্রয়োজন।

শিক্ষা শ্রমিক থেকে শুরু করে যেকোনো পেশাজীবীর কাজের গুণগত মান বাড়ায়-এ সত্য আজ সর্বজনস্বীকৃত। একজন শিক্ষিত গৃহিণী যিনি রান্না, কোটা, ধোওয়া, বাচ্চা পালনের কাজ নিজে করেন তাঁর কাজের মান নিরক্ষর পরিচারিকার কাজের মানের তুলনায় অনেক উন্নত হয়-এ তো আমরা দেখতে পাই। একই ভাবে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাই এবং সাধারণ হাতুড়ে দাই-এর কাজের মধ্যেও রয়েছে পার্থক্য। তেমনি ভালো কৃষক, মৎস্যজীবী, হাঁসমুরগি, গরুছাগল পালক, দর্জি বা সফল ব্যবসায়ী হতে হলেও শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে তা এসব ক্ষেত্রে সফল পেশাজীবীদের দেখলে বোঝা যায়।

বাস্তব ক্ষেত্রে, শিক্ষার এতসব অবদান সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে সব শিক্ষিতের অবস্থা একরকম নয়। বিশেষ করে শিক্ষিত বেকারের এ হাল কেন? শিক্ষা উন্নত জীবিকায় প্রবেশাধিকার লাভ করার যোগ্যতা আয়ত্ত করতে সাহায্য করে, অথচ সব শিক্ষিত একই মাপের জীবিকার উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হচ্ছে না কেন? এখানেই নিহিত আছে শিক্ষার গুণগত মানের ভিত্তিতে নানারকম শিক্ষার শ্রেণিবিভাগ যেমন, মানসম্মত শিক্ষা, মানহীন, সার্টিফিকেট সর্বস্ব শিক্ষা, অপ্রাসঙ্গিক এবং যুগের জন্য অনুপযোগী শিক্ষা, অতিরিক্ত মুখস্তবিদ্যা এবং হাতেকলমে কাজ করার সুযোগহীন শিক্ষা ইত্যাদি।

একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, যে ব্যক্তির শিক্ষার গুণগত মান ভালো, শুধুমাত্র ভালো ফল নয়, যে ভাষার মৌলিক দক্ষতা যেমন, পড়া, বোঝা এবং লিখার মাধ্যমে ভাব প্রকাশের দক্ষতা, মৌলিক গাণিতিক দক্ষতা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার দক্ষতা, সমস্যার সমাধান বের করার দক্ষতা এবং সর্বোপরি সৃজনশীল উদ্ভাবনী ক্ষমতা আয়ত্ত করেছে, সে যেকোনো পরীক্ষায়, চাকরিতে ভালো করে এবং চাকরিতে দ্রুত উন্নতি করে। তার হাতের কাছে উন্নত চাকরির দুয়ার খুলে যায় এবং সে এক চাকরি থেকে অন্য চাকরিতে সরে গিয়ে নিজের কাজের অভিজ্ঞতা বাড়ায়। এমন ব্যক্তির জন্য ভালো আয় কোনো অলৌকিক ঘটনা থাকে না বরং তা হাতের নাগালে ধরা দেয়। তাই বুঝতে হবে, শিক্ষা মানে মানহীন সার্টিফিকেট সর্বস্ব শিক্ষা নয়। এ শিক্ষা নকল, নম্বর বাড়িয়ে পাশ করা, ফল বদলে ভুল নম্বরপত্র বের করা, অনেকক্ষেত্রে ভুয়া

www.amarboi.org

সার্টিফিকেট বের করা ইত্যাদিতে নিয়োজিত শিক্ষার্থীকে আর যাই দিক, শিক্ষা, উপরক্ত মৌলিক দক্ষতাসমূহ আয়ত্ত করতে দেয়নি, সুতরাং ঐসব গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতাহীন একটি সার্টিফিকেট তাকে বাস্তব ক্ষেত্রে কতটা সাহায্য করতে পারবে, তা সহজেই কল্পনা করা যায়। সঙ্গত কারণেই এরা শিক্ষা নির্ভর চাকরিতে প্রবেশে ব্যর্থ হবে।

অনেকরকম শিক্ষা যেমন, ধর্মীয় শিক্ষার নামে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাদ্রাসা, মক্তব এবং মাদ্রাসা শিক্ষক, শিক্ষার্থী যে ধরনের শিক্ষা প্রদানে ও গ্রহণে নিয়োজিত রয়েছে, তা বর্তমান যুগের জন্য যে শুধু অনুপযোগীই নয়, এটা নিম্নবিত্তের অধিকাংশ সন্তানদের কম আয়ের জীবিকার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম অনেকটাই সাধারণ শিক্ষার সমমানের করা হয়েছে, কিন্তু এখানে নকল নির্ভরতা এত বেশি এবং শিক্ষকদের শিক্ষার মান এত নিচে যে মাদ্রাসাগুলো থেকে বের হয়ে আসা অধিকাংশ শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান হয় নিচু এবং এদের মন-মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে মধ্যযুগীয় ধর্ম উন্মাদনায় জারিত হয়ে। শুধু ধর্মতত্ত্ব এখানকার প্রধান বিষয় হলে সমাজে, এ শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষক-ছাত্রদের এত ক্ষতি হত না, যত না হচ্ছে এর অনেকগুলো ধর্মভিত্তিক সহিংস রাজনীতি অনুশীলনের ক্ষেত্রে পরিণত হওয়ার কারণে। ধর্মের নৈতিকতাকে প্রথমেই পর্যদুস্ত করে এখানকার নকল প্রবণতা, দ্বিতীয়ত, ধর্মের পরমতসহিষ্ণুতা মার খায় এখানকার ধর্ম রক্ষার নামে সহিংস রাজনীতি অনুশীলনের মাধ্যমে। সুতরাং এসব শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার নামে যে জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তার অধিকাংশই এ যুগের বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেক পেছনে পড়ে আছে। এই শিক্ষাকে যে অধিকাংশ ধর্মীয় ব্যক্তিও বর্তমান যুগের জন্য অনুপযোগী মনে করেন, তা তাদের সন্তানদের এ শিক্ষায় শিক্ষিত না করার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায়, যেসব ব্যক্তি টাকা উঠিয়ে মাদ্রাসা, মসজিদ স্থাপন করেন, তাদের অধিকাংশের সন্তানরা মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করেনি। একে যুগোপযোগী করতে হলে, মাধ্যমিক পর্যায়ে ধর্মশিক্ষা একটি বাছাই করে নেবার বিষয় হিসাবে থাকতে পারত এবং ধর্মশিক্ষায় যারা অগ্রসর হতে চাইবে তারা সম্মান ও মাস্টার্স পর্যায়ে এ বিষয় নিয়ে অগ্রসর হবে। বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতের চাকরির ক্ষেত্রে বাজার দর দেখেও যে কেউ বুঝতে সক্ষম হবে এটি এখনকার জন্য আর যুগোপযোগী নয়।

এছাড়াও সাধারণ শিক্ষায় দেখা যায়, চাকরি ক্ষেত্রে যেসব দক্ষতা প্রয়োজন হয় তার সাথে যা শেখানো হয় তার অনেক ক্ষেত্রেই অমিল রয়েছে।

www.amarboi.org

চাকরি ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় এমন কিছু সাধারণ দক্ষতা যা এ শিক্ষায় পাওয়া যায় না। বরং প্রাধান্য দেওয়া হয় বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও দক্ষতার ওপর। দেখা যায়, চাকরিতে প্রবেশ করে তারপর চাকরির সব দক্ষতা অর্জন করতে হয়। এ ক্ষেত্রেও বলতে হয়, এ শিক্ষা যদি মানসম্মত হয়, তাহলে শিক্ষাগ্রহিতা চাকরির দক্ষতাও দ্রুত আয়ত্ত করতে সক্ষম হবে।

এ ছাড়াও মানবসম্পদ ও তার সদ্ব্যবহারের জন্য তেমন কোনো পরিকল্পনা না থাকার কারণে আমরা দেখতে পাই শিক্ষার অপচয়। ডাক্তার, প্রকৌশলী হয়েও অনেকে প্রশাসক হচ্ছে, হচ্ছে ব্যাংকার, কেননা চাকরির সংখ্যা সীমিত। এছাড়া, একটি বিশাল দল, যারা তাদের মেধা অনুযায়ী চাকরি বা কর্মক্ষেত্র খুঁজে পায়নি, তারা এই মেধাকে সদ্ব্যবহার করার জন্য বিদেশের কর্মক্ষেত্রে যোগদান করছে। ফলে দেশ মেধাপাচারের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। সেখানেও উন্নতমানের শিক্ষাপ্রাপ্তরাই ভালো সুযোগ লাভ করছে, অন্যেরা নানারকম শ্রমভিত্তিক পেশায় যোগ দিয়ে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম করছে।

শিক্ষিত বেকারদের অনেকেই তাদের অবস্থার জন্য অনেকসময় শিক্ষাকে দায়ী করে। যেন, নিরক্ষর থাকলে তারা ভালো কৃষক হতে পারত, ভালো শ্রমিক হতে পারত, শিক্ষিত হওয়ায় শিক্ষা যেন তাদের এসব হওয়াতে বাধা দিচ্ছে। আসলেই কি তাই? আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষিত কৃষক, শ্রমিক না হোক, মাঝারী শিক্ষিত কৃষক, শ্রমিক হতে বাধা কোথায়? আসলে বাধা মানসিকতায়। হাজার বছর ধরে আমরা কৃষক, শ্রমিককে নিরক্ষর দেখে আসছি, শিক্ষিত যে কাউকে আমরা চাকরি করতে দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম। ডাক্তার, প্রকৌশলী, আইনব্যবসায়ী ছাড়াও অফিস, আদালতে ছোট বড় কর্মকর্তা, কেরানির অসংখ্য চাকরিতে প্রথম জেনারেশন শিক্ষিতদের দেখেছি। উচ্চ শিক্ষিত নয়, মোটামুটি শিক্ষিত না হলে আজকের উন্নত বীজ ও কৌশল ব্যবহার করে চাষাবাদ করা, হাঁসমুরগি, গরুছাগল পালনের উন্নত পদ্ধতি অনুসরণ করে এসব ক্ষেত্রে সফল হওয়া সম্ভব নয়। এরা সাক্ষর না হলে এসব ক্ষেত্রে আবিষ্কৃত নতুন নতুন জ্ঞান ও দক্ষতা আয়ত্ত করা এদের পক্ষে সম্ভব নয়।

যদি আমার আমাদের শ্রমজীবী মানুষের প্রতি লক্ষ্য করি, তাহলে এ সত্য উপলব্ধি করতে আমাদের অসুবিধা হয় না যে স্বাস্থ্য এদের জীবনের প্রধান পুঁজি। কৃষক, শ্রমিক, জেলে, কামার, কুমার থেকে শুরু করে রাজমিস্ত্রী, কাঠমিস্ত্রী, পাথরভাঙা নারীপুরুষ, গৃহপরিচারক/পরিচারিকা, ফেরিওয়ালা, এমনকি অফিসের পিয়ন সবার জীবনে একমাত্র পুঁজি হচ্ছে দৈহিক শ্রম এবং নিরোগ স্বাস্থ্য। অথচ শিক্ষার অভাবে নীরোগ থাকার উপায়গুলি সম্বন্ধে এরা

www.amarboi.org

সচেতন হয় না এবং নিরাপদ পানি, পুষ্টিকর খাদ্য, রোগজীবাণুমুক্ত খাদ্য ও অন্যান্য পরিপূরক স্বাস্থ্যসম্মত জীবনের অভ্যাস গঠনের ফল সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণে তারা, তাদের পরিবারের সদস্য প্রায়ই রোগে ভোগে এবং এর ফলে এদের আয় বন্ধ হয়ে যায়, সুচিকিৎসা গ্রহণ, পর্যাপ্ত সুষম খাবার গ্রহণ তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। বলাই বাহুল্য অপুষ্ট শরীর যেকোনো রোগের আক্রমণে ধরাশায়ী হয়। সাধারণত বস্তি বা গ্রামে রোগ ও দুর্ঘটনাপ্রবণ যে পরিবেশে তারা বাস করে সেখানে শিশুরা ঘন ঘন ডায়রিয়াসহ নানা রোগে ভোগে যার কারণ চরম অপুষ্টি যা দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে।

সুতরাং জনগণকে জনসম্পদে পরিণত করতে হলে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, এ দুইটিকে সাধারণ মানুষের জীবনের পুঁজি হিসাবে গণ্য করে এ দুটি ক্ষেত্রে যথার্থ ভালো মানের সেবা পৌছানোর লক্ষ্যে সরকার ও এনজিওদের একযোগে কাজ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, এ দুটি একে অপরের পরিপূরক, একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি অকার্যকর হয়ে পড়ে, অথচ এ দুই ক্ষেত্রে একযোগে মানুষ মানসম্মত সেবা লাভ করলে আমাদের বিপুলসংখ্যক মানুষ মানবসম্পদে পরিণত হতে দেরি হবে না।

www.amarboi.org

কৈশোর শিক্ষা : একটি সম্ভবনাময় ক্ষেত্র

কৈশোরকাল এমন একটা সময়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'এদের হাত পা দীর্ঘ হয়ে যায় বলে কাপড়-চোপড় ছোট হয়ে যায়, হাত-পায়ের সাথে শরীরের সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলে, এরা যেন শিশুও নয়, বয়স্কও নয়, মাঝখানে একটা যায়গায় বিসদৃশভাবে, সৌন্দর্যহীনভাবে দাঁড়িয়ে থাকে'। আসলেও কিশোর-কিশোরী না শিশু না বয়স্ক। এদের দেহ শুধু নয়, মনে যে রূপান্তরের প্রক্রিয়া চলে তাও তাদেরকে এক কঠিন অবস্থানে ঠেলে দেয় যার ভূমিকা সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট নয়। এদের অবস্থান কঠিন হয়ে ওঠে কেননা দরিদ্র পরিবারগুলো কিশোরদের উপার্জনকারী সদস্য হিসাবে দেখতে আগ্রহী শুধু নয়, এরা নিজেদের টিকিয়ে রাখার জন্য এদের শ্রম এবং আয়-এর মুখাপেক্ষী থাকে। নিদেনপক্ষে এদের নিজের আহার নিজেদের জোগার করতে হবে- এমন একটি সামাজিক চাপ এদের ওপর কাজ করে। পক্ষান্তরে, কিশোরীরা শুধু ছোট ভাই-বোনের পালনকারী নয়, ঘর-সংসারের যাবতীয় কাজ, জ্বালানি সংগ্রহ, পানি আনার মত পরিবারের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করতে বাধ্য থাকে। এছাড়াও, আমরা জানি এরা শুধুমাত্র মেয়ে বলে অতিরিক্ত যন্ত্রণার শিকার হয়। শুধু প্রতিবেশী পুরুষ কেন, নানারকম ভাই, চাচা, মামা, পিতার বন্ধু, এমনকি অনেক সময় পিতা কর্তৃক যৌনলাঞ্ছনার শিকার হয়। বিয়ে দিয়ে ওদের পার করার জন্য উৎসুক বাবা-মা যেকোনো বয়সী, যেকোনো পুরুষের সাথে এদের বিয়ে দেয় যখন অধিকাংশ পুরুষই প্রায় পশুর আচরণ নিয়ে এদেরকে মোকাবেলা করে। শ্বশুর বাড়িতে আরও আছে, পশুরূপী শ্বশুর, ভাশুর, দেবর। যৌতুক এবং পুত্রসন্তান ধারণে অক্ষমতার জন্য যে নিপীড়ন তাদের জন্য অপেক্ষায় থাকে তাতে পূর্ণমাত্রায় ইন্ধন যোগায় শাশুড়ি, ননদ নামের নারী, তারই মা-বোন-এর সম্প্রদায়। মাও কি দারিদ্র্যের তাড়নায় এসব কিশোরীকে বেশ্যাপাড়ায় দালালের হাতে তুলে দেয় না? পাশাপাশি আছে নগরের কিশোরদের বয়স্কের মত নিজ আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থার দায়িত্ব। নগর জীবনে অনেক কিশোর বড় হচ্ছে ফুটপাথে বা বাবা-মার আশ্রয়ের বাইরে। অনেকেই বাবা-মা থেকে নানাকারণে হচ্ছে বিচ্ছিন্ন এবং জীবনের কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে বাঁচার লড়াইয়ে নানারকম কাজে নিযুক্ত হতে গিয়ে

www.amarboi.org

সহজেই জড়িয়ে পড়ে অপরাধ জগতের সাথে। এই অবস্থান ও ভূমিকা নিয়ে বড় হয়ে উঠেছে যারা তাদের জন্য দীর্ঘকাল ধরে দেশে দেশে প্রায় কোনোরকম উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিকল্পনা করা হয়নি। ফলে একটি বিশাল গোষ্ঠী থেকে গেছে জাতির এবং প্রাতিষ্ঠানিক, সরকারি এবং বেসরকারি উন্নয়ন উদ্যোগের বাইরে। স্বাধীনতার পর পরই এদেশে পুনর্বাসন কাজের পাশাপাশি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে বেশ কিছু ব্যক্তি গোষ্ঠী সর্বপ্রথম গ্রামীণ দরিদ্র, নারী ও শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আয়বর্ধক কর্মসূচি গ্রহণ করে সরকারের পাশাপাশি জাতীয় উন্নয়নে লক্ষ্যে কাজ করা শুরু করে। দীর্ঘদিন দরিদ্র নারী ও শিশুর জন্য কাজ করার পর অনেক সংস্থার পরিচালক, সরকার, অনেক কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী এবং দাতা সংস্থা সমাজে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড থেকে বাদ পড়ে যাওয়া কিশোর-কিশোরীদের জন্য পরিকল্পিত কিছু উন্নয়ন কর্মকাণ্ড গ্রহণে এগিয়ে আসে। এদের বিবেচনায় যে বিষয়গুলি গুরুত্ব লাভ করে তা হচ্ছে :

১. খুব শিগগিরই কিশোর-কিশোরীরা পরিবার ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে মাতাপিতা, পেশাজীবী ও নাগরিক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করবে যাদের কাজের ওপর নির্ভর করবে ভবিষ্যতের পরিবার ও সমাজ জীবনের গুণগত মান।

২. এরা যেহেতু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বয়সে পরিণত সেহেতু এরা শিশুদের চেয়ে দ্রুততার সাথে শিক্ষাগ্রহণ করতে সক্ষম এবং সেহেতু এদের জীবনে বয়স্কদের মত পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা নেই, পিছুটান কম, দায়িত্ব কম, সেহেতু এরা বয়স্কর তুলনায় দ্রুত শিক্ষাগ্রহণ করে এবং নতুন জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে এরা শিশু ও বয়স্কের চাইতে অনেক বেশি কৌতূহলী ও আগ্রহী হয়ে থাকে।

৩. যেহেতু এরা কোনো না কোনো কাজে নিযুক্ত থাকে, সুতরাং শিক্ষাকে ব্যবহারিক জীবনে সরাসরি ব্যবহার করতে এরা শিশুদের চেয়ে পটু হয়ে থাকে।

৪. এরা পরিবার ও সমাজ কর্তৃক অবহেলিত অথচ এদের কাছে পরিবার ও সমাজের চাহিদা অনেক বেশি, সুতরাং এদেরকে উপযুক্ত জ্ঞান, দক্ষতা দ্বারা দক্ষ ও কুশলী করে তুললে পরিবার ও সমাজ এর সুফল ভোগ করবে।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পরিকল্পকদের উদ্দীপ্ত করার পক্ষে পর্যাপ্ত এবং বাস্তবিক, তাই কিছুদিনের মধ্যে সমাজ ও পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে যাওয়া গোষ্ঠীকে দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে উপযুক্ত পূর্বপ্রস্তুতি প্রদান করা যথার্থভাবে

www.amarboi.org

জরুরি হিসেবে গণ্য হলো। এভাবে দেশে দেশে কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের সূচনা হয়। কিছু কিছু সংস্থা শুধুমাত্র কিশোরীদের জীবন-মান উন্নয়নকে লক্ষ্য করে কর্মসূচি গ্রহণ করে কারণ নিম্নোক্ত শর্তগুলো কিশোরীদের জীবন অতিক্রম করে পারিবারিক কল্যাণ ও সমাজ উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

১. শিক্ষা কার্যক্রমে জড়িত হলে কিশোরীদের অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।

২. প্রাথমিক শিক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন করা বালিকারা প্রায়ই মাধ্যমিক শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী হয়ে ওঠে যা অনিবার্যভাবে তাদের বিয়ের বয়সকে বাড়িয়ে দেয়।

৩. বাল্যবিবাহ রোধ হলে অল্প বয়সে সন্তানধারণ করার ঝুঁকি হ্রাস পাবে, অনেক স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস পাবে, শিশুর মৃত্যু, প্রসূতির মৃত্যুর হার হ্রাস পাবে। দেরীতে বিয়ে হবে বলে সন্তান সংখ্যাও কম হবে, ফলে মেয়েদের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, সংসারে ও সমাজে শ্রম ও মেধাদান সহজ হবে।

৪. কিশোরীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি আয়মূলক কাজ করার সুযোগ প্রদান করে তাদের বিয়ের বয়সকে আরও বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। মা-বাবা যখন দেখে কিশোরী ঋণ পাচ্ছে গাভী বা ছাগল, হাস-মুরগী কিনেছে, পরিবারে এসবের আরও অন্যান্য উপকার আসছে, তখন স্বাভাবিক ভাবে তারা মেয়ের বিয়ের জন্য ব্যস্ত হন না। ফলে এদের ভবিষ্যতের পরিবার ছোট আকারের হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

৫. ছোট পরিবারেই মা, বাবা, সন্তানদের সব অধিকার নিশ্চিত করা অনেক সহজ, সন্তানরা সহজে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, উন্নতমানের খাদ্য লাভ করতে সক্ষম হয়। কিশোরীর উন্নয়ন তাই পরিণামে পরিবার ও সমাজের উন্নয়ন ঘটাতে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

এভাবে কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষা কার্যক্রম, উন্নয়ন কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শিক্ষা না উন্নয়ন, অর্থাৎ সাক্ষরতা নাকি উপার্জনের পথ খুলে দেওয়া- কোনটি কৈশোর শিক্ষায় প্রাধান্য লাভ করবে এ নিয়ে নানা বিশেষজ্ঞের নানা মত রয়েছে, রয়েছে নানা বিতর্ক। এ কথা অনস্বীকার্য যে শিক্ষা শুধু সাক্ষরতার মাধ্যমে শিক্ষিতের কাছে জ্ঞান, দক্ষতার দ্বারোন্মোচন করে দেবে নাকি সে মানুষের আয়-উন্নতির জন্য প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করবে। এ বিষয়টি প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের জন্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও

www.amarboi.org

কিশোর কিশোরী যারা অনতিবিলম্বে সমাজের পরিবারের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে, কর্মজীবনে প্রবেশ করবে, তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। সমাজ তখন তাদের সক্ষমতা বিচার করে তারা কতটা আয় করেছে, তা পরিমাপ করে। বাস্তবিক, আয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি- শিক্ষার একটি অন্যতম অন্তর্নিহিত লক্ষ্য যা প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত না শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া না হয় অথবা শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থী কর্মজীবনে প্রবেশ করে।

এছাড়া দরিদ্র অসুবিধাগ্রস্ত মানুষের কাছে সাধারণ শিক্ষা তার আবেদন হারিয়ে ফেলেছে, যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষার্থীর আয়-উপার্জন ও নিরক্ষরের আয়-উপার্জনের মধ্যে তেমন একটা পার্থক্য আপাতদৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। সাধারণ শিক্ষার সুফলে অধিকাংশই সহজে পরিমাপযোগ্য নয়, তাই সেসব অদৃশ্য থাকে এবং এসব সরাসরি উপার্জনক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে না বলে নিরক্ষর দরিদ্র এবং শিক্ষিত দরিদ্রের মধ্যে তেমন পার্থক্য অনেকের পক্ষে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। এইসব বিতর্কের কারণে, অধিকাংশের মত হচ্ছে কৈশোর শিক্ষায় বৃত্তিমূলক, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত হওয়া উচিত। এমন বিতর্কও রয়েছে- এ গোষ্ঠীর জন্য আগে সাধারণ শিক্ষা, নাকি আগে বৃত্তিমূলক শিক্ষা, নাকি দুটোই পাশাপাশি চলবে? এ বিবেচনা থেকে নানা দেশে 'Earn while learn'-এর ধারণা বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং সংসারে প্রবেশের আগে কিশোর কিশোরীরা যাতে কোনো না কোনো ধরনের বৃত্তি শিখতে পারে তার ব্যবস্থা করা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

দেখা যাচ্ছে, বৃত্তিমূলক শিক্ষার নামে হাঁস-মুরগি পালন, ছাগল-গরু পালন, মৎস্য চাষ, শাক-সবজি চাষ, দর্জিবিজ্ঞান ইত্যাদি ইত্যাদি অধিকাংশ সংস্থার উন্নয়ন কর্মসূচির প্রশিক্ষণে প্রাধান্য লাভ করেছে। অপরদিকে অ-প্রথাগত বৃত্তি যেমন, ড্রাইভিং, মেকানিকের বিভিন্নরকম কাজ (টিউবওয়েল, কল, জেনারেটর, টিভি, ফ্রিজ, রেডিও ইত্যাদি) ইলেক্ট্রনিক জিনিস মেরামত, গাড়ির ইঞ্জিন মেরামত, বিদ্যুৎ লাইন, টেলিফোন লাইন ও সেট মেরামত, সেলাই মেশিন, কলকারখানার মেশিন, এসি মেরামত, কৃষি যন্ত্র মেরামত, কাঠমিস্ত্রীর কাজ, নির্মাণ কাজ ইত্যাদি অধিকাংশ সংস্থার প্রশিক্ষণের বাইরে থেকে যায়, অথচ এই দক্ষতাগুলো আয়-উপার্জন বৃদ্ধিতে অনেক বেশি কার্যকর। প্রশিক্ষকের অভাব একটি বড় কারণ হলেও, কর্মসূচিকে লাগসই করার উদ্ভাবনমূলক চিন্তা-ভাবনার অভাবও এর আরেকটি কারণ। দেখা যাচ্ছে, কৈশোর শিক্ষা বা কৈশোর জীবন শিক্ষা নামের আওতায় সাক্ষরতা বয়ঃসন্ধিকালের শারীরিক পরিবর্তন, যৌন ও প্রজনন জ্ঞান, এ সম্পর্কিত রোগ

www.amarboi.org

সম্পর্কে জ্ঞান, পরিবার পরিকল্পনার কৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রাধান্য লাভ করেছে। কোনো কোনো সংস্থা যেমন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্বাধীনতার পর থেকেই কিশোরী-তরুণীদের অ-প্রথাগত জীবিকা যেমন গাড়ি চালনা, কাঠ ও অন্যান্য উপকরণের টেবিল-চেয়ার ফার্নিচার তৈরি, ছাপাখানা, ওষুধ তৈরি, হাসপাতাল পরিচালনায় নিয়োজিত করে তাদের জীবনের মানোন্নয়নে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সংযোজন করেছে যা অন্য সংস্থাকে তেমন প্রভাবিত করেনি। এখানে দেখা যায়, আয়মূলক কাজে আগ্রহী, উৎসাহী মেয়েরা বিকালের সাক্ষরতা কর্মসূচিতে অনাগ্রহী, কিছুটা ক্লান্তও। সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে আসার আগেই সাক্ষরতা প্রদানের কাজ না করা গেলে সংসারী নারীর পক্ষে হাজার দায়িত্ব ও কাজের ফাঁকে ক্লান্ত শরীরে, চিন্তাকীর্ণ মনে সাক্ষরতার মত কঠিন দক্ষতা যা শিক্ষার্থীর গভীর, ঐকান্তিক এবং ধারাবাহিক মনোযোগ দাবি করে, তা অর্জন সম্ভব হয় না। এ কারণে, মেয়ে ও ছেলে উভয়ের ক্ষেত্রেই, সংসারে প্রবেশের পূর্বে সাক্ষরতা কর্মসূচির মাধ্যমে সাক্ষর করে তোলার প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে বয়স্ক শিক্ষার নামে বিপুল অর্থ ও সময় ব্যয়কে কমিয়ে আনতে সাহায্য করবে।

আরেকটি বিষয়ের কারণে কৈশোর উন্নয়ন কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে পারে। দেশে দেশে আজ মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়, অসহিষ্ণুতা, সহিংসতা, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, ভিন্নমতাবলম্বীর প্রতি হিংসা, নানা ধরনের সন্ত্রাস, অপকৌশল, অপতৎপরতা সমাজকে চরম অস্থিতিশীল করে সমগ্র মানবসমাজকে নাজুক অবস্থায় দাঁড় করিয়েছে তা প্রতিরোধ করে এ ধারাকে বিপরীত মুখে পরিচালনা করতে হলে সমাজ শিশু ও কিশোর উন্নয়ন কর্মসূচিতে মানবিক মূল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের চর্চা, প্রশিক্ষণ সন্নিবেশন করে তা সম্ভব করতে পারে। শিশুর মনে যেমন, তেমনি কিশোর-কিশোরীর মনে মানবিক ধর্ম, সহমর্মিতা, ভালবাসা, স্নেহ,বন্ধুত্ব, দয়া, সহযোগিতা, শ্রদ্ধা, ভিন্ন ধর্ম, সম্প্রদায়-উপজাতির সংস্কৃতির ভেতর সৌন্দর্য্য দেখা ও তা উপভোগ করা- এসব গভীরভাবে রেখাপাত করে যা কখনোই বয়স্কের পরিণত মনকে তেমনভাবে প্রভাবিত করতে পারে না তাই শিশু এবং কিশোর-কিশোরীর মনে সততা, নিষ্ঠা, ধৈর্য, আত্মত্যাগ ইত্যাদি মৌলিক মানবিক রীতিনীতিগুলোর বীজ বপন করতে পারলে, এসব গুণের উপযুক্ত চর্চার সুযোগ পেলে এ গুণগুলো এদের মনে স্থায়ী আসর গেঁড়ে বসবে যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করবে। আসলে সৎ মানুষের খোঁজে রাস্তায় নেমে লাভ নেই, শিশু-কিশোরদের মধ্যে সৎ মানুষের বীজ বপনের কাজ করতে হবে। কাজটি কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয়। একদিন এদেশের গ্রামীণ নারী ঋণ লাভ করবে, তা ভাবা যেত না, এখন সেটিই উন্নয়নের অন্যতম কৌশল হিসাবে সারা বিশ্বে সমাদৃত।

www.amarboi.org

দেশ ও জাতি এ মুহূর্তে পরিকল্পক, কর্মসূচি প্রণেতাদের কাছ থেকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, কার্যকর, অর্থ ও সময়সাশ্রয়ী সত্যিকারের যথোপযুক্ত কৈশোর উন্নয়ন কর্মসূচি আশা করে। সম্ভাবনাপূর্ণ এ গোষ্ঠীটিকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারলে বয়স্করা অপেক্ষাকৃত শান্তিতে বসবাস করতে পারবে, শিশুরা শান্তির নীড়ে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারবে। সামগ্রিকভাবে দেশ ও জাতি লাভবান হবে।

www.amarboi.org

শিক্ষকের দায়বদ্ধতা

দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধিকাংশ শিক্ষকের বিভিন্ন সময়ের আচরণ দেখে এ বোধ হয় যে, সমাজের প্রতি শিক্ষকের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সমাজের অন্যান্য শিক্ষিত পেশাজীবীর মতোই তাঁদের অধিকাংশই হয় অজ্ঞ, নতুবা অর্ধসচেতন, কেউ কেউ পুরোপুরি অচেতন।

সমাজে প্রচলিত দেশিয় প্রথা অনুসারে একজন শিক্ষকের ভাবমূর্তি কি? সমাজ শিক্ষককে অবশ্যই অগ্রপথিক এবং পথ প্রদর্শক হিসেবে গণ্য করে। পাড়ার মানুষের কোনো বিবাদ বিসম্বাদে শিক্ষককে মধ্যস্থ মানার একটা ঐতিহ্য আছে এ দেশে। পাড়ার যে কোনো বিষয়ের কমিটি বা সমিতিতে শিক্ষক পুরোভাগে থাকেন। বিপুল এ নিরক্ষরের দেশে তিনি একটি বিশুদ্ধ সম্মানের স্থান অর্জন করেছেন- এটা কম কথা নয়। তাঁর চারিত্রিক গুণাবলির একটি উজ্জ্বল রূপরেখাও তৈরি হয়েছে সেই সাথে। যে অনুসারে তিনি একজন নির্লোভ, চরিত্রবান, স্পষ্টবাদী, যুক্তি ও ন্যায়ানুসারী, স্নেহপ্রবণ কিন্তু প্রয়োজনে কঠোর নিয়ম প্রতিষ্ঠাকারী, শৃংখলাপরায়ণ, সংযমী ব্যক্তি।

সমাজ আশা করে-অন্য পেশাজীবীর পক্ষে কঠিন হলেও একজন শিক্ষক অতি সহজে তাৎক্ষণিক ব্যক্তিগত লাভ-লোকসান ও স্বার্থের উপরে উঠতে পারেন। শিক্ষকের বাড়ি গাড়ি এখনো সমাজের পক্ষে কষ্ট কল্পনা! শিক্ষকের বেশবাস পর্যন্ত সমাজের চোখে এত নির্দিষ্ট যে সুটেড বুটেড শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়েও খুব বেশি দৃষ্টিগোচর হয় না। সমাজের কল্পনা শিক্ষকদের বেশবাস সংযত, সাধারণ, দৃষ্টিনন্দন, সর্বোপরি ভদ্র জনোচিত করে রেখেছে।

শিক্ষকের বাঞ্ছনীয় আচরণ কি? পুরো সমাজ শ্রেণি নির্বিশেষে একজন বিনয়ী, মিষ্টিভাষী কিন্তু কঠোর শৃংখলাপ্রিয় শিক্ষককেই আকাঙ্ক্ষা করে। নরমে গরমে মানুষ- এমন একজন শিক্ষকই সবার কাছে গ্রহণীয়। এমনকি শিশু শিক্ষার্থীর কাছেও। কে ভুলে পারে সেই শিক্ষককে যিনি দুষ্টুমিকে পরীক্ষার খাতার নম্বরের সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে ফেলেননি। যিনি দুষ্টুমি, চঞ্চলতা এবং অপরাধের মধ্যে তফাৎ করতে সক্ষম, যিনি সে সবের মাত্রা অনুযায়ী বিচার করতে পারছেন এবং বয়সের ধর্মের নিরিখে সব কাজ কর্মকে বিবেচনা করতে

www.amarboi.org

আগ্রহী তাকে আমরা কে ভুলতে পেরেছি? আমাদের মন থেকে তাঁর আসন টলাতে পেরেছে কে?

শিক্ষকের বিবেচনা শক্তির উপর সমাজ আস্থাবান। সমাজ আশা করে একজন শিক্ষক নিজেকে অপরের অবস্থানে ও ভূমিকায় দাঁড় করিয়ে সবকিছুর বিচারে সক্ষম। অপরের প্রতিক্রিয়া ও কাজকর্মের নেপথ্যে ক্রিয়াশীল প্রভাব বিস্তারকারী শক্তির ভূমিকা হৃদয়ঙ্গম করতে তিনি তুলনাহীন— এ আমরা সবাই আশা করি।

সমাজ আশা করে শিক্ষক অবশ্যই উদার ও নিরপেক্ষ আচরণ করবেন। তাঁর উদারতার পরিসর হবে বিস্তৃত যাকে ধর্ম, শ্রেণি, বংশ, আত্মীয়তার যোগসূত্র কোনোকিছুই সীমিত বা খণ্ডিত করবে না। এ উদারতা তাকে দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট নানা বঞ্চনাজাত ক্ষুদ্র স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আচরণের গণ্ডীকে অতিক্রম করে নিয়ে যাবে। অনায়াসে তিনি এসব ক্ষুদ্রতাকে গ্রাহ্য করবেন এবং এসবের প্রতি উদাসীন থাকবেন। স্বেচ্ছাকৃত অমনোযোগ দিয়ে শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষার্থীর এসব আচরণকে গুরুত্বহীন করে তুলবেন। শিক্ষক জানেন, কত গুরুত্বহীন খুঁটি নাটি ঝামেলা, ঝঞ্চাটে জড়িয়ে পড়া অবস্থার মধ্য দিয়েও মানুষকে কোনো বিশেষ লক্ষ্যাভিমুখী কাজ চালিয়ে যেতে হয়। শিক্ষকের আচরণ শিক্ষার্থীকে এসবের প্রতি উদাসীন হবার শিক্ষা জোগাবে।

কিন্তু যখন কোনো অন্যায় সংঘটিত হয় তখন কেমন হবে শিক্ষকের অভিপ্রেত আচরণ? একটি ভীরু, মেরুদণ্ডহীন সমাজও আশা করে শিক্ষক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে সোচ্চার হবেন, কখনো নীরবে প্রতিবাদী হবেন এবং সরবে, নীরবে হবেন ন্যায়ের পক্ষে আপসহীন। যে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না তার চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়নি। তেমন মানুষ আর যেই হোন শিক্ষক নন কোনোমতেই একজন শিক্ষক ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে পক্ষাবলম্বন করেন না। তাঁর কাছে যা অন্যায় তা যুক্তিগ্রাহ্যভাবে সবার কাছে অন্যায় বলে গণ্য হবে।

শিক্ষক কিভাবে কাজকর্ম পরিচালনা করেন? অবশ্যই সব পেশার মানুষকে কাজ পরিচালনার জন্য কতগুলো নিয়মের সৃষ্টি করতে এবং তা অনুসরণ করতে হয়। এ নিয়মগুলো শিক্ষকের জন্য ধর্ম স্বরূপ। তিনি কি লক্ষ্যে কি বিষয়, কি নিয়ম রীতিতে পড়ান, কি নিয়মে শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের মূল্যায়ন করেন, কি নিয়মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের আনুসঙ্গিক কাজকর্ম পরিচালনা করেন তা একটি যুক্তিযুক্ত ব্যক্তি নিরপেক্ষ নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। প্রয়োজনে তা তিনি ব্যাখ্যা করতে পারেন। এসব কাজে সহসঙ্গী হন তার অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দ। এভাবেই শিক্ষক নৈর্ব্যক্তিক ভূমিকা আয়ত্ত করেন এবং

www.amarboi.org

পক্ষপাতমুক্ত হয়ে ওঠেন। দল, মত, ব্যক্তি স্বার্থের ওপরে ওঠার বিকল্প কোনো পথ নেই। ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করার ফলে নীতি রক্ষা করা যায় না। যার ফলে একটি প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো ভেঙ্গে পড়ে, যার পরিণতি দোষী-নির্দোষ সবাইকে ভোগ করতে হয়।

শ্রেণিকক্ষেও একজন শিক্ষক একজন দক্ষ পরিচালকও বটে। পুরো শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মন মেজাজকে তিনি এক সুরে বেঁধে দেন। তাঁর এমন এক ক্ষমতা থাকে যা শ্রেণির উদাসীনতম, দুষ্টু শিক্ষার্থীর মনকেও বশ করে। নিয়ম ও শৃংখলার প্রতি শ্রদ্ধার সাথে সাথে অনাবিল স্নেহ প্রকাশের সুযোগের সদ্ব্যবহারকারী বুদ্ধিমান শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিতে সক্ষম - কিসে তাদের মঙ্গল, কি তাদের প্রয়োজন, কিভাবে তারা সফল হতে পারে। কোনো কোনো বিশেষ বোধ, সচেতনতাও শিক্ষককে শ্রেষ্ঠ পরিচালক করে তুলতে পারে। এমন দু'একটি বোধ - মুক্তিযুদ্ধের প্রতি একাত্মতা, শহিদ দিবসে শিক্ষার্থীদের সাথে অংশগ্রহণ করে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন। তাঁর বাক্যে, আচরণে, অনুভূতিতে ও কাজে প্রতিফলিত এ বোধ তাঁকে অন্য শিক্ষকের মধ্যে ভিন্ন করে তোলে এবং শিক্ষার্থীরা তাঁকে ইতিবাচক মানসিকতার অধিকারী প্রগতিশীল ব্যক্তি বলে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে। এ সম্মানিত শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে যত কিছু করাতে পারবেন অন্যে তা পারবে না। কেননা দেশপ্রেমের চেয়ে বিপুল ভাবাবেগসঞ্চারী বিষয় শিশু, তরুণের কাছে আর নেই।

শিক্ষক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টি অর্জন করেন যিনি শিক্ষার্থীদের পক্ষ হয়ে অনেক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভিন্ন গুণাগুণ ঠিকমতো চিনে নিয়ে শিক্ষাসহ তাদের জীবনের নানা বিষয়ে উপদেশ পরামর্শ সঠিক হচ্ছে কিনা, তা তিনি বার বার ভেবে দেখেন। এ বিষয়ে তিনি সতর্ক থাকেন, কেননা একদিকে যেমন শিক্ষার্থীর মন-মানসিকতা, আদর্শ, মূল্যবোধ শিক্ষকের মধ্য থেকে সঞ্চারিত হয় তেমনি অধিকাংশ বিষয়ে শিক্ষার্থী শিক্ষকের বাক্যকে শিরোধার্য মানে।

শিক্ষকের কথা পরস্পর বিরোধিতামুক্ত, বিভ্রান্তিমুক্ত। আজ একরকম, কাল আরেক রকম কথা শিক্ষক বলেন না। তার কথা বিচিত্র, বিভিন্ন প্রসঙ্গে ও উদাহরণে উজ্জ্বল কিন্তু বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী লক্ষ্য অভিমুখী নয়। শিক্ষক প্রতি মুহূর্তে সচেতন থাকেন তাঁর ভুল নির্দেশনার ফলে অগণিত শিক্ষার্থীর জীবনে নেমে আসে কালো যবনিকা।

শিক্ষক একজন চিকিৎসকও বটেন। তিনি শ্রেণির সব শিক্ষার্থীর রোগ শনাক্ত করেন অর্থাৎ শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করেন। তিনি জানেন কে ভাষায় দুর্বল, কে স্মরণশক্তিতে দুর্বল, কে বিশ্লেষণশক্তিতে কমজোর এবং সেভাবে

www.amarboi.org

তাদের নিরাময়ের ব্যবস্থা করেন। অভিভাবকদের চেয়েও তিনি শিক্ষার্থীর দুর্বল দিকটি ভালো জানেন এবং সযত্নে, সস্নেহে তাকে তা অতিক্রম করার ব্যবস্থা দেন।

শিক্ষক শিক্ষার্থীর সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু ও সহযোগী। এমন কোনো সমস্যায় শিক্ষার্থী পড়তে পারে না যা সে শিক্ষককে বলতে অপারগ। অর্থনৈতিক থেকে রাজনৈতিক, শিক্ষাগত, পারিবারিক এমনকি প্রেম-অপ্রেম জনিত মনোগত সমস্যাও শিক্ষার্থী তার শিক্ষকের কাছে উন্মোচন করতে পারে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর বহু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যার নীরব সাক্ষী। এসব ক্ষেত্রে তাঁর সঠিক ও ঠিক সময়ের সহযোগিতা, প্রচেষ্টা, যথাযথ পরামর্শ অনেক শিক্ষার্থীকে বহু পরাজয়ের হাত থেকে উদ্ধার করে। বিবেচক শিক্ষক মনে রাখেন দূর মফঃস্বল থেকে বড় বিদ্যাপীঠে পড়তে আসা শিক্ষার্থীর তিনিই চেনা মানুষ। অপরিচিত স্থানে আর কে তাকে সাহায্য করতে পারে?

শিক্ষক কৌশলী ব্যক্তি। প্রতি শিক্ষার্থীকে তার লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যে তিনি সর্বোত্তম পথটি নির্বাচন করতে সক্ষম। তাঁর নির্বাচিত পথ ধরে পরিকল্পিত উপায় অবলম্বন করে শিক্ষার্থী তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপস্থিত হবে। কৌশলী শিক্ষক বিচক্ষণতার সাথে বাস্তববুদ্ধির সাথে দূরদৃষ্টির সমন্বয় করে এ পথ তৈরি করেন। কৌশলী শিক্ষকের উদ্ভাসিত এ পথ তাই হবে অভ্রান্ত এবং এ পথে নির্ভয়ে পা ফেলবে সব শিক্ষার্থীর দল।

শিক্ষক সুযোগ সৃষ্টিকারী। তাঁর পরিকল্পিত শ্রেণির কাজে শিক্ষার্থী যেমন পরীক্ষা নিরীক্ষার, তার মেধাকে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার ও অনুশীলন করার সুযোগ পায় তেমনি এ সুযোগের ফলে সে ব্যক্তিগতভাবে বৃদ্ধি ও বিকাশ লাভ করে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী তাঁর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় মনোযোগ লাভ করে এবং উপযুক্ত নির্দেশ-পরামর্শ দ্বারা উপকৃত হয়। শ্রেণিশেষে প্রত্যেকে অনুভব করে আজ সে কিছু করেছে অথবা কোন দিক থেকে তার বৃদ্ধি বা বিকাশ ঘটেছে।

শিক্ষক শিক্ষার্থীর পথ নির্দেশক ও পথ প্রদর্শক। তিনি এক কথায় শিক্ষার্থীর সম্মুখে মডেল বা আর্দশ স্বরূপ। তাঁর বাচন ভঙ্গি, শব্দ ব্যবহার, রুচি, আচরণ, বিশ্বাস, আদর্শ, শৃংখলা ও ন্যায়পরায়ণতা এমনকি পোশাক পরিচ্ছদ সবকিছুই শিক্ষার্থীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তাঁর নীতিপরায়ণ নিরপেক্ষ ভূমিকার পক্ষপুটে পুষ্ট ও সবল হয়ে ওঠে শিক্ষার্থীর মানসিকতা, এবং ব্যক্তিত্ব। তাঁকে অনুসরণ করে শিক্ষার্থী হয়ে ওঠে সৃজনশীল, মানবপ্রেমিক, সংবেদনশীল। তাঁর পক্ষপাতপূর্ণ আচরণ, পরস্পবিরোধী আচরণে দ্বিধাগ্রস্ত হয় শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব।

www.amarboi.org

শিক্ষক একজন মূল্যায়নকারী। এ ভূমিকায় নিহিত রয়েছে শিক্ষকতার দায়বদ্ধতা, পেশার দায়িত্ববোধ এবং সর্বোপরি নিরপেক্ষতার শক্ত ভিত্তি। তাঁর পরিষ্কার ধারণা থাকে তিনি কি, কেন, কখন, কিভাবে মূল্যায়ন করছেন। খাতা দেখা ও ফল প্রকাশের সময়সীমা তিনি মান্য করে কেননা সময় অতিক্রম করলে শিক্ষার্থী ভর্তি, চাকুরির পরীক্ষা ইত্যাদি জনিত সমস্যা ভোগ করে। প্রত্যেকের মেধার প্রতি সুবিচার ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তিনি মোট নম্বরকে ভাষা, বানান, তথ্য, উপস্থাপন রীতি, অতিরিক্ত তথ্য ইত্যাদি ভাগে বিভাজন করে নেন। এছাড়াও আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন তিনি - কি ধরনের ভুলের জন্য কত নম্বর কাটবেন, তাও ঠিক করে নেন। সকল ভুলের মাশুল সবার জন্য সমান-এটি প্রতিষ্ঠা করা শিক্ষকের নৈতিক দায়িত্ব। তিনি মনে রাখেন শিক্ষার্থীই নম্বর অর্জন করে, তিনি নম্বর দেবার মালিক নন। এভাবে শিক্ষক শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও দক্ষতার নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করেন এবং এ মূল্যায়নে তাঁর আবেগ, মেজাজ কোনো প্রভাব ফেলবে না। এ মূল্যায়ন তাঁকে তাঁর শিক্ষকতার মান ও কার্যকারিতা সম্পর্কেও ধারা দান করে। তিনি এ মূল্যায়নের ফলকে শিক্ষার্থীর শিখন এবং শিক্ষকের শিক্ষণের যৌথ ফল হিসেবে মানেন। এ যৌথ প্রচেষ্টায় তাঁর ভূমিকা কতখানি কার্যকর হয়েছে তা দেখে তিনি ভবিষ্যৎ শিক্ষণের ধারা নির্ধারণ করেন।

শিক্ষক জ্ঞান সাধক। যিনি জ্ঞান দান করেন তিনি অবিরাম জ্ঞানচর্চায় ব্যাপৃত থাকেন নতুবা সময়ের জ্ঞানে তিনি নিজে পিছিয়ে পড়বেন এবং শিক্ষার্থীদেরকেও পিছিয়ে রাখবেন। শিক্ষকতা এমন এক সৃজনশীল কাজ যা অবিরত নতুনের সংযোজনে পুষ্টিলাভ করে। শিক্ষক প্রতিদিন কিছু না কিছু নতুন জ্ঞান আহরণ করে নিজেকে সজীব ও যোগ্য রাখেন।

শিক্ষক কুশলী অভিনেতা। যে কোনো জ্ঞানকে তিনি কুশলতার সাথে তাঁর শিক্ষকতায় ব্যবহার্য করে তোলেন। বিদেশের জ্ঞান তাঁর হাতে স্বদেশী হয়ে ওঠে। এ কারণে যেমন তিনি শব্দ, বাক্য, তথ্য ও ভাবকে মিলিয়ে সমন্বিত করে একটি পাঠ উপস্থাপন করতে সক্ষম তেমনি একটি খবর, একটি ঘটনা, একটি মন্তব্য, একটি ছবি, দু-একটি ফুল, পাতা, নুড়ি, কাঠি ইত্যাদিকে সার্থকভাবে ব্যবহার করে সজীব, প্রাণবন্ত পাঠ সৃষ্টি করেন তিনি। তাঁর এ পাঠ শিক্ষার্থীর সামনে উন্মোচন করে নতুন দিগন্তের, জন্ম দেয় নতুন আশা এবং স্বপ্নের।

শিক্ষক আর কি কি করেন বা করেন না?

শিক্ষক কোনোক্রমেই অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য নিজের নাক কাটেন না বা নিজের পায়ে কুড়োলও মারেন না। দল, মত অনুসরণ করেও

www.amarboi.org

এর উপরে উঠে শুভ এবং ভালোকে ভালো, মন্দ ও অশুভকে মন্দ বলার সততা তিনি কখনো হারান না।

শিক্ষকের প্রধান কাজ - শ্রেণিকক্ষে তিনি নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হন। তাঁর সঙ্গে থাকে তাঁর পূর্ব প্রস্তুতি। আন্তরিক শিক্ষক কোনো অসুবিধা থাকলে পূর্বাহ্নে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সময়মত তা জানিয়ে দিতে ভোলেন না। পাঠ্যসূচি সমাপ্ত না হলে বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থীদের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা মান্য করেন। স্বল্প সংখ্যক মূল্যবান বই পাঠাগার থেকে তিনি নিজে নিয়ে আটকে রাখেন না। কদাচ একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীর দুর্বলতা নিয়ে ব্যঙ্গ- কৌতুক করেন না।

শিক্ষক নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থে শিক্ষার্থীদের ব্যবহার করেন না। ভিন্ন দল থেকে উচ্চ পদ যেমন অধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক বা উপাচার্য ইত্যাদি পদাধিকারীদের কার্যাবলিকে প্রতিষ্ঠানের জন্য শুভ এবং অশুভ-এর নিরিখে বিচার করে সত্যিকার গণতান্ত্রিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটাবেন। এ কথা তিনি মনে রাখেন এক একবার এক এক দলের ব্যক্তি ঐ পদ অর্জন করবেন। শিক্ষকের এ মনোভাব শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সকল সংঘাত অবসান করতে সক্ষম। শিক্ষক কোনো ক্রমেই ভিন্নমতের প্রশাসকের শুভ এবং ইতিবাচক প্রচেষ্টাকে বিনষ্ট করার কাজে মনোনিবেশ করবেন না। শিক্ষকের গণতান্ত্রিক আচরণের প্রতি নিষ্ঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিপুল সমস্যা দূর করতে সক্ষম শুধু নয় এর চেয়ে উপযোগী কার্যকর পন্থা আমার আর জানা নেই।

নিরপেক্ষ এবং ন্যায়নিষ্ঠ শিক্ষক বিশৃংখল, অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত শিক্ষার্থীদের মুখোমুখী হতে পারবেন এবং হস্তক্ষেপ করে শিক্ষার্থীদের সস্নেহে যথাযথ নির্দেশ দিতে পারবেন। লক্ষ্যহীন অপরাধমূলক কাজ আর গঠনমূলক কাজ ও রাজনীতির বৈশিষ্ট্য বোঝাতে সক্ষম শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বহু অপরাধ, পারস্পরিক সংঘর্ষ হ্রাস করতে পারদর্শী। অনিবার্য পতনের হাত থেকে শিক্ষার্থীকে রক্ষাকারী এ শিক্ষক দ্রুত শিক্ষার্থীর আস্থাভাজন হয়ে উঠেন।

এ শিক্ষকের কাছে কোন শিক্ষার্থী শ্রদ্ধায় মাথা নত করবে না?

www.amarboi.org

শিক্ষা ও টেকসই উন্নয়ন

শিক্ষা শুধু মানবাধিকার নয়, এটি সামাজিক খাতের অন্যতম ক্ষেত্র যার রিটার্ন অথবা ফল হাতে হাতে পাওয়া না গেলেও শিক্ষা যে মানুষের এবং সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির প্রধান অনুঘটক, তা আজকের দুনিয়ায় সর্বজনমান্য। নানা দেশে পরিচালিত নানা গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত শিক্ষার সঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্রের এবং ব্যক্তির উন্নয়নের ঘনিষ্ঠ সম্পদকে প্রমাণ করেছে। এই হিসাবের মধ্যে শিক্ষার কতগুলো অ-সাধারণ বিশেষত্বকে গণ্য করা হয়েছে যা স্বাস্থ্য খাতের টীকা বা

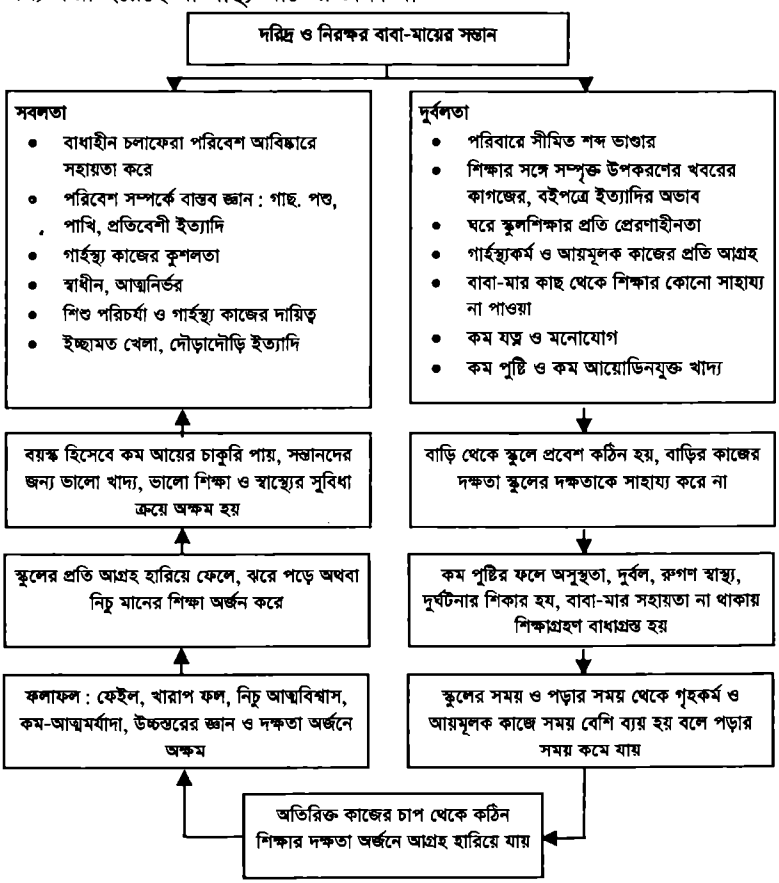

www.amarboi.org

আয়রন বড়ি অথবা জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি বা কনডম ব্যবহারের সংখ্যার হিসাবের মত নয়। শিক্ষার ফল কেমন হয় তা দেখতে গিয়ে শিক্ষার পাঁচ, দশ, বারো, ষোলো বছর মেয়াদি শিক্ষাস্তরের প্রডাক্ট বা পাশ করা গ্র্যাজুয়েটদের জীবন, জীবিকা, আয়, জীবনমান অর্থাৎ নিরাপদ পানি, স্যানিটারি পায়খানা, বিদ্যুতের ব্যবহার, খাদ্যপুষ্টির মান, সন্তান সংখ্যা, কন্যা সন্তানের শিক্ষার সুযোগ, পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য, চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ, পুত্র-কন্যার শিক্ষা ও জীবিকার মান, নারীদের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার ইত্যাদি আরও অনেক কিছুর পাশাপাশি নিরক্ষর বা অল্প-শিক্ষিতের জীবন, জীবিকা তাদের সন্তান সংখ্যা, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবহার, কন্যার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ, পুত্র-কন্যার শিক্ষার মান ও জীবিকার মান, নিরাপদ পানি, স্যানিটারি পায়খানা, বিদ্যুতের ব্যবহার, খাদ্য-পুষ্টির মান, পরিবারে নারীর অবস্থান ও মর্যাদা এবং তাদের স্বাধীন মত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আছে কিনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তুলনা করলেই একমাত্র শিক্ষার প্রতিদান বা রিটার্ন যে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কত গভীর এবং কত সুদূরপ্রসারী, তা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। সোজা কথায় বলা যায়, শিক্ষিত মানুষ নিরক্ষর মানুষের তুলনায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনেক বেশি সফল হয়ে থাকে। একটি গবেষণা প্রতিবেদন থেকে গৃহীত দুটি ফিগার পরীক্ষা করে দেখলে শিক্ষার সুদূরপ্রসারী প্রভাব বা অবদান সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে সহজে আরও সুস্পষ্ট করতে পারি। প্রথম ফিগারটিতে দরিদ্র ও নিরক্ষরের সন্তানদের সবলতা ও দুর্বলতা কিভাবে তাদের জীবন ও জীবিকাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে, তা দেখা যাবে।

দেখা যাচ্ছে দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা এমন একটি দুষ্টচক্রের জন্ম দিচ্ছে যা শিক্ষার বিপক্ষে এবং সেহেতু জীবনমান উন্নয়নের বিরুদ্ধে কাজ করছে। এমন কি এই অসুবিধাগ্রস্ত শিশুদের সবল দিকগুলো, বাস্তব ও পরিবেশ জ্ঞান, স্বাধীন মনোভাব, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, দায়িত্বশীলতা এবং হাতে-কলমে কাজের কুশলতা, আয়মূলক কাজের দক্ষতা তাদের পড়াশুনা গ্রহণের প্রক্রিয়াকে কোনোভাবে সাহায্য তো করেই না বরং কোনো কোনো কাজ বাধা দান করে। আর এ কথা তো অনস্বীকার্য যে পুষ্টির অভাবে তারা প্রায়ই রোগে ভোগে, পরিবেশের দূষণ সম্পর্কে অনবহিত নিরক্ষর বাবা-মার অজ্ঞতাও তাদের রোগ বাড়াতে ভূমিকা রাখে এবং রোগের কারণে স্কুলে অনুপস্থিতি শিক্ষা গ্রহণকে আরও কঠিন করে তোলে। কঠিন পাঠগুলো এদের অনায়ত্ত থেকে যায়, সুতরাং তারা স্কুলের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে হয় স্কুল থেকে ঝরে পড়ে নতুবা নিম্নমানের শিক্ষা নিয়ে কোনোরকমে পাশ করে। এরকম নিচু মানের

www.amarboi.org

শিক্ষা অবশ্যই ভালো আয়ের চাকুরি বা অন্য সুযোগ দিতে পারে না এবং মাধ্যমিকসহ উচ্চস্তরের শিক্ষা গ্রহণও তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সুতরাং এদের সন্তানরাও একই নিম্নমানের শিক্ষা ও জীবিকার দুষ্টচক্রে বন্দি হয়ে পড়ে। বিপরীতে দ্বিতীয় ফিগারটি দেখা যেতে পারে।

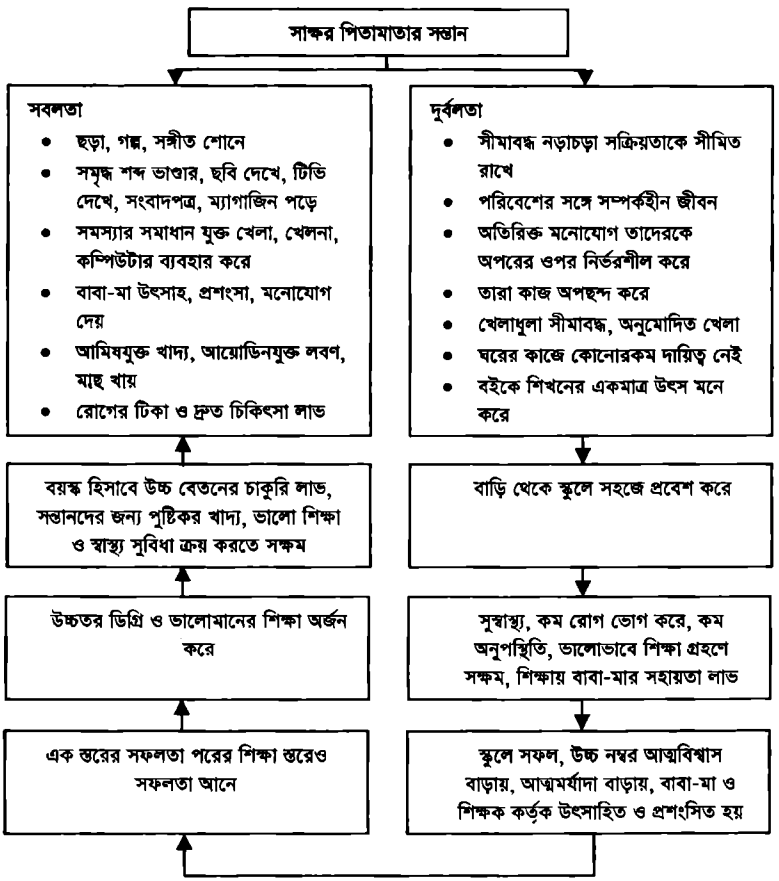

এই শুভ চক্রটিতে দেখা যাচ্ছে শিক্ষিত পরিবারের সন্তানেরা শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ব-প্রস্তুতি বাড়িতেই লাভ করে এবং সেই কারণে স্কুলে প্রবেশ তার জন্য সহজ হয়ে ওঠে। এদের দুর্বলতাগুলো দরিদ্রের সন্তানদের সবলতা হলেও যেহেতু শিক্ষাক্রমে এসব দক্ষতার কোনো প্রভাব নেই, সেজন্য এগুলো তাদের শিক্ষাগ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না! অপর দিকে তারা ভালো খাদ্য ও দ্রুত

www.amarboi.org

টিকা ও চিকিৎসা পেয়ে নীরোগ থাকে ফলে স্কুলে অনুপস্থিতি কম ঘটে এবং শ্রেণি কক্ষের পাঠে পিছিয়ে পড়ে না বা তাদের সামনে অনায়াত্ত পাঠের বোঝা জমা হয় না, উপরন্তু ভালো ফল করে এবং বাবা, মা ও শিক্ষকের প্রশংসা লাভ করে যা তাদের আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। সঙ্গত ভাবেই এক স্তরের ভালো শিক্ষা পরের স্তরগুলোতেও সফলতা আনে। সুতরাং শিক্ষা শেষে এরা ভালো মানের উচ্চশিক্ষা ও ডিগ্রি দ্বারা ভালো আয়ের চাকুরি লাভ করে। এভাবে শিক্ষিতের সন্তানরা একটি শুভ চক্রের মাধ্যমে উন্নত জীবনযাত্রা ও জীবিকার সুযোগ লাভ করে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে- সমাজে শিক্ষিত বেকার দেখা দিচ্ছে কেন? শিক্ষা শিক্ষিত বেকারের জন্ম দিচ্ছে কেন? আসলে শিক্ষা জন্ম দিচ্ছে সাক্ষর ও শিক্ষিত মানুষের। বেকারের জন্ম হচ্ছে সমাজে অর্থনৈতিক ক্রিয়া কর্মের অনুপস্থিতি বা সীমাবদ্ধ তৎপরতা এবং স্ব-নিয়োজিত আয়মূলক কাজের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর্তৃক সৃজনশীল পন্থা উদ্ভাবনে ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানে সক্ষম না হওয়ার ফলে। তাছাড়া যুগোপযোগী নানারকম পেশা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে রাষ্ট্র অপারগ হওয়ায় এ ধরনের সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। সে আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।।

এখন প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের কথায় আসা যাক। শিক্ষা নিয়ে আলোচনায় উন্নয়ন কর্মীরা কোনো না কোনোভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম একটি শর্ত- কর্মসূচির সাসটেইনেবিলিটি বা স্থায়িত্বশীলতার প্রশ্ন তোলেন, যেমন, রাষ্ট্র প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক দিচ্ছে যা প্রাথমিক শিক্ষাকে রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল করে রেখেছে, সুতরাং এ ব্যবস্থা সাসটেইনেবল নয়। একইভাবে বৃত্তি, গম, শিক্ষার জন্য খাদ্য সম্পর্কেও এই অভিযোগ তোলা হয়। একজন দরিদ্র নিঃস্ব মানুষকে ঋণদান করে তারপর তাকে তার দারিদ্র্য-হ্রাসে সাহায্য করা সম্ভব, ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে গ্রামীণ ব্যাংক, আশা, ব্র্যাক, সরকারি উদ্যোগ গ্রামীণ দরিদ্রের দারিদ্র্য হ্রাসের উদ্যোগ নিয়েছে বলে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নারী-পুরুষের একটি অংশ কোনো না কোনো আয়মূলক কাজ করে তাদের ক্রয় ক্ষমতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, এ কথা অনস্বীকার্য। বলা হয়, এই সব বয়স্ক নারী-পুরুষ এই ঋণ সুদে -আসলে ফেরত দেয় এবং এ কারণে এই কর্মসূচিকে সাসটেইনেবল বলা হয়। আগেই প্রবন্ধের শুরুতে বলেছি যে, শিক্ষার রিটার্নকে সংখ্যার দ্বারা গণনা বা হিসাব করা কঠিন কারণ এর প্রতিদান প্রধানত গুণগত অর্থাৎ শিক্ষিত ব্যক্তি বেকার থাকলেও সে পুকুর-নদীর অশোধিত পানি সহজে পান করবে না, সে নিরাপদ পানি খুঁজে তা পান করবে, মাছি বসা খাবার সে খাবে না, পায়খানায় সে খালিপায়ে যাবে না, দৈনিক

www.amarboi.org

একবার অন্তত সে দাঁত মাজবে, মুখ ধোবে, শরীর পরিস্কার রাখতে চেষ্টা করবে। বিবাহিত হ'লে অবশ্যই সে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির কোনো একটি ব্যবহার করে সন্তান সংখ্যা কম রাখবে। সুতরাং শিক্ষার অবদানকে এই রকম অসংখ্য জীবনমানের উন্নয়নের সূচকের মাধ্যমে যদি দেখা যায়, তাহলে শিক্ষাকে, যদি তা হয়ে থাকে গুণগত মানসম্মত, স্থায়িত্বশীল বা সাসটেইনেবল স্বচ্ছন্দেই বলা যায়।

বিষয়টি আমরা আরও একটু পরিস্কার করে দেখতে চেষ্টা করতে পারি। সন্তানের শিক্ষার পেছনে সরকার বা বাবা-মা যে বিনিয়োগ করে, ধরা যাক, তা নিম্নরূপ :

সরকার

- বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান
- বেতনহীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান
- স্কুলে শিক্ষা উপকরণ প্রদান
- শিক্ষকদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষক নির্দেশিকা প্রদান
- স্কুলঘর নির্মাণ ও মেরামত
- শিক্ষকদের বেতন প্রদান
- দরিদ্র শিশুদের বৃত্তি/গম প্রদান, স্কুল টিফিন বা পুষ্টি বিস্কিট প্রদান

বাবা, মা

- গৃহশিক্ষকের সাহায্যে সন্তানের শিক্ষায় সহায়তা প্রদান
- পোশাক, টিফিন, খাতা, কলম অতিরিক্ত বই কেনা
- রাতে পড়ালেখা, বাড়ির কাজ করার জন্য কেরোসিন/বাতির জন্য ব্যয় করা
- পরীক্ষার ফি হিসাবে অর্থ ব্যয় করা
- অনেক স্কুলে পাঠ্যপুস্তক গ্রহণের সময় অর্থ প্রদান করা
- আয়মূলক কাজ না করে সন্তানের স্কুলে সময় দিতে গিয়ে পরিবারের আয় হ্রাসকে মেনে নেওয়া

সরকারের বাইরে উপরিউক্ত শিক্ষাখাতের ব্যয়গুলো সাধারণ মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তের বাবা-মায়ের সন্তানদের জন্য করে থাকে। আমাদের জানা আছে, উচ্চশিক্ষিত, সচ্ছল বাবা-মায়েরা শিক্ষার প্রতিদান বা রিটার্ন সম্পর্কে অবগত হয়ে তাদের সন্তানদের যেসব অগ্রসর শিক্ষা উপকরণ দিয়ে থাকেন তার মধ্যে উন্নতমানের বইপত্র, নানারকম সমস্যা সমাধানের দামি পাজ্‌ল, খেলনা, শব্দ-বাক্য শেখার উন্নত দেশের বই এবং কম্পিউটার অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া ভালো

www.amarboi.org

শিক্ষককের কাছে কোচিং অথবা ব্যাচে পড়ার পাশাপাশি এমন শিক্ষিত বাবা-মা কম আছেন যারা সন্তানের শিক্ষার মান বাড়ানোর লক্ষ্যে নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়ে তাদের পাঠে সহায়তা না করেন। উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা খুব ভালো করেই জানেন, বোঝেন যে আজ যদি বেশি অর্থ ব্যয় করে সন্তানের শিক্ষার ভিতটি শক্ত করে গড়ে দেয়া যায়, তাহলে তার যে রিটার্ন আসবে তা সন্তানের পরবর্তী জীবনের উন্নয়নে প্রধান প্রভাবক হিসাবে কাজ করবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই, আমাদের আশেপাশে অসংখ্য শিক্ষিত বাবা-মা এবং তাদের সন্তানেরা সুশিক্ষা লাভের জন্য যেভাবে প্রতিযোগিতায় নেমেছে, সেটি শিক্ষার দূরবর্তী কিন্তু উচ্চমানের রিটার্নের প্রমাণ দেয়।

সুতরাং একটি রাষ্ট্র যদি তার প্রাথমিক শিক্ষার মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যত কিছু প্রয়োজন সেসবকে অনুদান, দান বা বিনামূল্যে প্রদানের ব্যবস্থা করে, তাহলে এই মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণকারী শিশুরা তাদের মাধ্যমিক ও উচ্চস্তরের লেখাপড়া সুসম্পন্ন করে জীবিকার সর্বক্ষেত্রে উন্নত দক্ষতা প্রদর্শন করবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ অনেকগুণ বেশি রিটার্ন দিতে সক্ষম, তা সুশিক্ষিত ব্যক্তি-নারী-পুরুষের জীবন-জীবিকাকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। দরিদ্র নিরক্ষর মানুষের সন্তানেরা যারা প্রাথমিক শিক্ষার সিংহভাগ শিক্ষার্থী, তাদের জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক, বিনাবেতনে পড়ার সুযোগ, বৃত্তির অর্থ যেমন তাদেরকে শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করবার ব্যবস্থা করেছে, তেমনি এর পাশাপাশি তাদের মা-বাবা তাদের জন্য রাতে পড়াশুনার জন্য তেল বা বিদ্যুত খাতে ব্যয়, প্রাইভেট পড়ার জন্য ব্যয় করে তাদের শিক্ষার মানকে উন্নত করার জন্য তা বলা বাহুল্য। দারিদ্র্যের মধ্যে বাবা-মাও এই ব্যয় করছে, তার প্রধান কারণ মানসম্মত শিক্ষা সম্পন্ন করে সন্তানেরা যেন বাবা-মা'র চাইতে আরও ভালো আয়ের কাজ করতে সক্ষম হয়-এই লক্ষ্য অর্জন এর নিহিত কারণ।

সেই জন্য বলতেই হয় যে, শিক্ষা রিটার্নহীন কোনো বিনিয়োগ নয়। শিক্ষার রিটার্ন দেরিতে আসবে, কিন্তু তার রিটার্ন অন্য যেকোনো ধরনের বিনিয়োগের রিটার্নের চাইতে বেশি বৈ কম নয়। আজ, বাংলাদেশের দরিদ্র, হত-দরিদ্র, অসংখ্য কর্মহীন-জীবিকাহীন মানুষের দরিদ্র, নিরন্ন শিশুদের কাছে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে একটি সুফল প্রদানকারী প্যাকেজ ব্যবস্থায় পরিণত করার কোনো বিকল্প নেই। এই দূরবর্তী সুফল প্রদানকারী প্যাকেজ ব্যবস্থা এক এক দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে পরিকল্পিত হবে এবং বাংলাদেশের

www.amarboi.org

এই চরম দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের সন্তানদের জন্য বর্তমানে প্রচলিত ব্যবস্থা সহ আরও দুটি ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। সেগুলো হল :

- বিনামূল্যে স্কুলে পুষ্টিকর মধ্যাহ্ন খাবার প্রদান
- সুনির্দিষ্ট ফি গ্রহণ করে স্কুল শেষে অথবা স্কুল বর্ষের শুরুতে প্রথম ২/৩ মাসে স্কুলভিত্তিক কোচিং বা নিরাময়মূলক শিক্ষা প্রদান। উল্লেখ্য যে, দরিদ্র বাবা-মা এখন গৃহশিক্ষা খাতে সাধ্যাতীত ব্যয় করছে অথচ শিশুরা মানসম্মত শিক্ষা অর্জন করতে পারছে না।

এ কথা সকলের জানা যে, দরিদ্র শিশুরা অভুক্ত, অর্ধভুক্ত অবস্থায় স্কুলে যায় এবং মধ্যাহ্নের পর তারা অভুক্ত অবস্থায় সামান্য টিফিন খেয়ে লেখাপড়ায়, খেলাধুলায় মনোনিবেশ করতে অক্ষম থাকে অথবা বাড়িতে খেতে যাবার পর আর দূরের স্কুলে ফিরে আসতে পারে না এবং এটি আশা করাও অন্যায়। তাছাড়া স্কুলে মধ্যাহ্ন খাদ্যের ব্যবস্থা করে শিশুদের পুষ্টিমানে উন্নত করা গেলে শিশুদের দৈহিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে তা ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে-এটা পরীক্ষিত সত্য। সুতরাং বৃত্তি বা গমের পরিবর্তে স্কুলে মধ্যাহ্ন খাবারের ব্যবস্থার মাধ্যমে সুদূরপ্রসারী ফল পাওয়া যাবে যা শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করতে এবং পড়াশুনায় কৃতিত্বের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে সাহায্য করবে বলে নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

শিশুদের প্রয়োজন হচ্ছে প্রধানত পুষ্টিকর খাদ্য এবং শিক্ষার প্রধান দক্ষতা-পড়া, লিখা বা হিসাব করার দক্ষতাগুলো ভালোভাবে আয়ত্ত করতে সঠিক সহযোগিতা লাভ। এর সঙ্গে অবশ্যই প্রয়োজন-বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক লাভ, স্কুলে পড়াশেখার, খেলার ও বিনোদনের সুযোগ লাভ। অনেকে মনে করেন, শিশুদের বাড়িতে যে খাবার প্রতিদিন তৈরি হয়, শিশু তাই স্কুলে নিয়ে আসবে এবং তাই দুপুরে খাবে-এটাই সাসটেইনেবিলিটির শর্ত হবে।

এ ধারণার বিপরীতে বিভিন্ন ব্রেন ও বুদ্ধি সম্পর্কিত গবেষণার ফল থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলো উপস্থাপন করা হলে দরিদ্র শিশুর বাড়ির দৈনন্দিন খাবার যে তার বুদ্ধি ও অন্যান্য বিকাশের জন্য অপ্রতুল, তা বোঝা যাবে।

- গবেষণায় দেখা গেছে, শিশুদের ব্রেনের বা মস্তিষ্কের বিকাশ যার ওপর বুদ্ধির মান নির্ভর করে তা দুই/তিন বছরের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যায়। এর ওপর কিছুটা উন্নয়ন সাধন করা যায় ৮ বছর বয়স পর্যন্ত। এরই মধ্যে শিশুর বুদ্ধি ও অন্যান্য ক্ষেত্রের বিকাশের ভিতটি পাকা হয়ে যায়। পরে আর বেশি কিছু করা সম্ভব নয়।
- বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় খাদ্যের যা বুদ্ধি ছাড়াও দৈহিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও প্রধান অবদান রাখে।

www.amarboi.org

9789840 416738